রত্নেশ্বরীর কালোছায়া

০১-২. তানিয়ার স্কুল আর বন্ধুরা

১. তানিয়ার স্কুল আর বন্ধুরা

টিফিন পিরিয়ডের ঘন্টা শেষ হতেই তানিয়ার বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হলো। ফিফথ পিরিয়ডে মরিয়ম আপার ভূগোলের ক্লাস। গত সপ্তাহে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন ড্রইং খাতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র এঁকে আনতে হবে। বলেছেন, শুধু পেন্সিলে আঁকলে চলবে না। রঙিন পেন্সিলে সীমারেখা আর নদী আঁকবে। পাহাড়ী এলাকার জন্য ব্যবহার করবে, প্যাস্টেল রঙ।

কিভাবে আঁকতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে মরিয়ম আপা থুতনি নামিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের সবার প্যাস্টেল রঙ আছে তো?

দুতিন জন ছাড়া সদ্য ক্লাস এইটে ওঠা সব মেয়ে কোরাসে বললো, আছে আপা।

প্যাস্টেল হলে রিলিফের উঁচু নিচু ভাবটা সুন্দরভাবে বোঝানো যায়। যাদের নেই তারা কাল পরশু কিনে ফেলবে।

কথাটা খুব সহজ গলায় বলেছিলেন মরিয়ম আপা। নিজে বড়লোকের মেয়ে, গাড়িতে স্কুলে আসেন। টিচারের চাকরিটা তাঁর সখের। সবাইকে নিজের মতোই ভাবেন। তার কথা শুনে লাস্ট বেঞ্চের তানিয়ার গলা শুকিয়ে এমনই কাঠ হয়ে গিয়েছিলো যে ঢোক গিলতেও পারছিলো না।

প্যাস্টেল, রঙ পেন্সিল দূরে থাক তানিয়ার ড্রইং খাতা পর্যন্ত নেই। মাসের তেইশ তারিখে ড্রইং খাতা কেনার কথা বললেই বাবার গম্ভীর চেহারা আরও গম্ভীর হয়ে যাবে। রঙ পেন্সিল আর প্যাস্টেল কেনার প্রশ্নই ওঠে না। সামনের বেঞ্চের সীমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো প্যাস্টেলের দাম কত। সীমা বিজ্ঞের মতো বলেছে, ভালো প্যাস্টেল চার পাঁচশ টাকার নিচে নয়। সবচেয়ে সস্তা যেটা তারও দাম একশ টাকা। বড়লোকের মেয়ে হলেও সীমা অন্যদের মতো নাক উঁচু স্বভাবের নয়।

একটা ড্রইং খাতার দাম তিরিশ টাকা। রং পেন্সিলের বাক্স পঁচিশ টাকা, প্যাস্টেল একশ টাকা। গত সাতদিনে যতবার তানিয়া হিসেব করেছে ততবার দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি।

মা বেঁচে থাকতে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে মাসের শেষে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জমাতে পারতেন। মা মারা যাওয়ার পর থেকে খরচ যা করার বাবাই করেন। খুব দরকার না হলে বুয়ার। হাতেও টাকা পয়সা

দেন না। বুয়া অবশ্য আজকাল আড়ালে গজ গজ করে পান খাওনের পয়সা দেয় না, নিত্যি নিত্যি মাইনষের বাড়িত গিয়া পান খাওন যায়!

মরিয়ম আপার হাত থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পাওয়ার একটা পথ অবশ্য তানিয়ার সামনে খোলা ছিলো। ও জানে ফাস্ট বেঞ্চ থেকে এক এক করে খাতা দেখবেন তিনি। ভালো খারাপ যাই হোক মন্তব্য করবেন, সবাইকে দেখাবেন, তারপর নম্বর দেবেন। তানিয়ার আগে চল্লিশটা খাতা দেখতে হবে। প্রতি খাতা দেখতে যদি এক মিনিট করে লাগে তানিয়ার ডাক আসার আগেই পিরিয়ড শেষ হয়ে যাবে। যাদের বাকি থাকবে তাদেরটা পরের সপ্তায় দেখবেন। সামনের মাসের শুরুতে বাবাকে ড্রইং খাতা আর রঙ পেন্সিলের কথা বলা যাবে।

এত সব ভাবার পরও তানিয়ার ভয় যায়নি। যদি কোনও খাতা দেখতে এক মিনিটের কম লাগে, কিংবা যদি মনিটরকে বলেন সবার খাতা এক সঙ্গে তাঁর টেবিলে জমা দেয়ার জন্য তাহলেই ধরা পড়ে যাবে। নরম গলায় এমন সব শক্ত কথা বলেন মরিয়ম আপা কান্না সামলানোই কঠিন! গত ক্লাসেই রুমকিকে বলছিলেন, বাবার টাকা পয়সা তো কম নেই? হোমওয়ার্ক করতে কষ্ট হলে দুটো হাউস টিউটর রাখলেই তো হয়। নাকি পড়াশোনারই ইচ্ছে নেই। চেহারা খারাপ না, বাপের টাকাও আছে, লেখাপড়ার জন্য বিয়ে আটকাবে না। এরকম সব হুল বসানো কথা শুনে রুমকি সারা পিরিয়ড ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে।

তানিয়ার উপায় নেই। মা মারা গেছেন এক বছরের ওপর। তানিয়ার কান্না আজও ফুরোয়নি। বাবা সামান্য বকুনি দিলেই ওর চোখ ফেটে কান্না আসে। মা বেঁচে থাকতে বাবা কোনও দিন ওকে বকেননি। মাস ছয়েক হলো বাবার মেজাজ খুবই খিটখিটে হয়ে গেছে। এমনই এক স্কুলে মাস্টারি করেন যেখানে তিন চার মাস বেতন বাকি থাকে। মা বেঁচে থাকতে গোটা চারেক টিউশনি করতেন। সব সময় মেজাজ করেন বলে আজকাল ওঁকে কেউ বেশি দিন টিউশনিতে রাখতে চায় না। বয়স পঁয়তাল্লিশ হলেও দেখে মনে হয় পঞ্চাশের ওপর। এ বয়সেই মুখে বয়সের ভাঁজ পড়েছে, চুলও প্রায় সব সাদা হয়ে গেছে। স্কুলে হেড মাস্টারের ধমক খেলে কিংবা টিউশনির কোনও ছাত্রছাত্রীর বাবা মা কড়া কথা বললে বাড়ি ফিরে তানিয়ার ওপর রাগ ঝাড়েন।

তানিয়ার আরও কান্না পায় যখন মনে হয় মা বেঁচে থাকতে এই বাবাই ওকে কত মজার মজার বই পড়ে শুনিয়েছেন। ট্রেজার আইল্যাণ্ড, এ্যাডভেঞ্চার অব হাকলবেরি ফিন, মবি ডিক, লিটল প্রিন্স, কিং সলোমনস মাইস্–এসব বই বাবা ইংরেজিতে পড়ে ওকে বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। মজার মজার

ইংরেজি বই বাবা ওঁদের স্কুলের লাইব্রেরি থেকে আনতেন। বাংলা বই তানিয়া নিজেদের স্কুল লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়তো। মা মারা যাওয়ার পর ওর গল্পের বই পড়ার অভ্যাসও চলে গেছে।

টিফিনের পর দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে তানিয়া ক্লাসে এসে লাস্ট বেঞ্চের কোণে বসে মার কথা ভাবছিলো। মরিয়ম আপা খুব গম্ভীর মুখে ক্লাসে ঢুকলেন। মেয়েদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। কোনও কথা না বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। তারপর বললেন, অংকের মেহেরুননেসা আপার কথা তোমাদের মনে আছে?

মেয়েরা সবাই একটু অবাক হলো। কয়েকজন বললো, আছে আপা!

মেহেরুননেসা আপা কখনও তানিয়াদের ক্লাস নেননি। এইট, নাইন, টেন-এ অংক করাতেন তিনি। চল্লিশ বছর একটানা আনন্দময়ী স্কুলে শিক্ষকতা করার পর মাস ছয়েক আগে অবসর নিয়েছেন। তাকে যেদিন ফেয়ারওয়েল দেয়া হলো সেদিন অনেক অভিভাবকও এসেছিলেন। ছোট খাট গড়নের, সব সময় সরু পাড়ের সাদা শাড়ি পরতেন। খুব টান টান করে। খোঁপা বাঁধতেন, মাথার চেয়ে খোঁপা বড় ছিলো। ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রামে তাঁর বক্তৃতা শুনে তানিয়ার খুব কান্না পেয়েছিলো।

আপা ভারি গলায় বললেন, আজ সকালে মেহেরুননেসা আপা মারা গেছেন।

মেয়েরা কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারলো না। ওদের ক্লাস না নিলেও স্কুলের সবাই মেহেরুননেসা আপাকে খুব ভালোবাসতো। ক্লাসের মনিটর রেহানা দাঁড়িয়ে মরিয়ম আপাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, র কী হয়েছিলো?

বয়স তো কম হয়নি! ভেজা গলায় আপা বললেন, একা থাকতেন। হাই ব্লাড প্রেসার ছিলো। ঘুমের ভেতরই হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। সকালে কাজের মেয়ে এসে দেখে বিছানায় মরে পড়ে আছেন।

মরিয়ম আপার অবস্থা দেখে মনে হয় না আজ আর হোম ওয়ার্ক দেখবেন। তানিয়া তবু খুশি হতে পারলো না। মেহেরুননেসা আপাকে ওরও খুব ভালো লাগতো। আদর করে তানিয়াকে তিনি গানের পাখি ডাকতেন। গত বছর মা মারা যাওয়ার খবর শুনে ছুটির পর ওকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বলেছিলেন, মা না থাকা যে কী কষ্টের আরেকটু বড় হলে বুঝবি। তোর তো বড় বোনও নেই। আমি অবশ্য তোর চেয়ে ছোট থাকতে বাবা মা দুজনকে হারিয়েছি। স্কুলের কোনও টিচার তানিয়াকে এভাবে সান্ত্বনা দেননি।

মরিয়ম আপা বললেন, একটু পরে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। আমি আশা করবো মেহেরুননেসা আপার আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য ছুটির পর তোমরা কেউ মাঠে হই হল্লা না করে চুপচাপ বাড়ি চলে যাবে। যাদের নিতে আসবে তারা বাড়িতে ফোন করে বলতে পারো।

ফোর্থ গার্ল পারুল বললো, আমাদের বাড়িতে ফোন নেই আপা। চাচা আমাকে সাড়ে চারটায় নিতে আসবেন।

অনিতা বললো, আমাদেরও ফোন নেই আপা।

তানিয়ার স্কুল জীবনে এই প্রথম আগে থেকে না বলে বিনা নোটিসে হঠাৎ ছুটি হলো । মরিয়ম আপা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, যাদের ফোন নেই অথচ বাড়ি থেকে নিতে আসবে, তারা চুপচাপ বসে অপেক্ষা করবে। কোনও হই হল্লা করবে না।

কথা শেষ করে মরিয়ম আপা গম্ভীর মুখে বসে থাকলেন। মেয়েরা কেউ এতটুকু শব্দ করলো না। মারা যাওয়ার সময় মেহেরুননেসা আপার পাশে কেউ ছিলেন না–কথাটা ভাবতে গিয়ে তানিয়ার বুকের ভেতর কান্না জমে জমে গলার কাছে ব্যথা করছিলো। মিনিট পাঁচেক পর ছুটির ঘন্টা বাজলো। মরিয়ম আপা উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে হেঁটে আপা ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। কোন রকম হল্লা না করে মেয়েরাও তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে এলো।

তানিয়ার পাশে চুপচাপ হাঁটছিলো পারুল। ভালো ছাত্রীদের ভেতর পারুলের সঙ্গেই ওর বেশি ভাব। যে দুটো মেয়ে ফার্স্ট আর সেকেণ্ড হয় ওদের নাক এত উঁচু যে পেছনের বেঞ্চের মেয়েদের চোখেই পড়ে না। বিশেষ করে ফাস্ট গার্ল মুনা কখনও মুখোমুখি হলে চশমার ভেতর দিয়ে তানিয়াদের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন ওরা মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছে। পারুল বলে, ফার্স্ট হলে কী হবে, হিংসার ডিপো একটা।

হাঁটতে হাঁটতে পারুল বললো, তুই কি এখনই বাড়ি যাবি তানিয়া?

বাড়ি না গিয়ে কী করবো? বিষণ্ণ গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলো তানিয়া। ওকে কেউ স্কুলে নিতে আসে না। সকালে বুয়া যখন বাজারে বেরোয় তখন তানিয়া ওর সঙ্গে স্কুল পর্যন্ত এক সঙ্গে আসে। তানিয়াদের স্কুল পেরিয়ে নয়া বাজারে যেতে হয়।

পারুল করুণ গলায় বললো, সবাই তো বাড়ি চলে যাচ্ছে। চাচা আসা পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবি?

তুই যদি থাকতে বলিস থাকবো।

থেকে যা তানিয়া। পারুলের মুখে হাসি ফুটলো–তোকে জোবেদালির দোকান থেকে পেয়ারা কিনে খাওয়াবো।

সকালে যদিও তানিয়া ভাত খেয়ে স্কুলে আসে ফিফথ পিরিয়ড শেষ না হতেই খিদেয় পেট চিন চিন করতে থাকে। ছুটির পর বাড়ি ফিরে এক বাটি মুড়ি আর দু গ্লাস পানি খেয়ে খিদের আগুন নেভাতে হয়। মাঝে মাঝে কোন বন্ধু জোর করে পেয়ারা না হয় ডালপুরি কিংবা সিঙাড়া কিনে খাওয়ায়। জোর না করলে তানিয়া কখনও অন্যের কেনা কিছু নেয় না। ও জানে কেউ দুদিন খাওয়ালে ওকে একদিন অন্তত খাওয়াতে হবে। মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন ওকে টিফিনের কৌটোয় দুটো সিঙাড়া নয়তো ঘরে বানানো নিমকি দিতেন। মা মারা যাওয়ার পর বাবা কোনও দিন জানতে চাননি তানিয়া স্কুলে টিফিন করে কিনা কিংবা ওর হাত খরচের জন্য টাকা পয়সা কিছু লাগবে কিনা। তানিয়াও এ নিয়ে বাবাকে কিছু বলেনি।

স্কুলে ঢোকার পথের ধারে ছাগুলে দাড়ি জোবেদালি রকমারি আচার আর পেয়ারা নিয়ে বসে। কখনও পেয়ারা না থাকলে জাম, করমচা, আমড়া পাকা জলপাই নয়তো লটকন–কিছু একটা থাকবেই। আমের সময় দারুণ মজার কাঁচামিঠে আম বিক্রি করে জোবেদালি। তানিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পারুল ওর দোকান থেকে চার টাকা দিয়ে মস্ত বড় দুটো ভঁসা পেয়ারা কিনলো। জোবেদালি ধারালো ছুরি দিয়ে পেয়ারা দুটো চার ফালি করে ভেতরে ঝাল মেশানো

লবন ছড়িয়ে দিলো। দেখে তানিয়ার চোখ দুটো চক চক করে উঠলো।

গাইড আর বু বার্ডদের পিটি করার মাঠের পাশে বকুল তলায় বসে পেয়ারা খেতে খেতে পারুল বললো, মরিয়ম আপার হোমওয়ার্ক করেছিলি তানিয়া?

না। শুকনো গলায় তানিয়া বললো, তুই করেছিলি?

করেছিলাম তাড়াহুড়ো করে। ভালো হয়নি। দেখতে চাইলে নম্বর বেশি পেতাম না। একটু থেমে পারুল জানতে চাইলো, তুই করিসনি কেন?

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে তানিয়া আস্তে আস্তে বললো, আমার ড্রইং খাতা, রঙ পেন্সিল আর প্যাস্টেল কোনওটাই নেই।

বলিস কী! অসময়ে স্কুল ছুটি না হলে মরিয়ম আপা তোকে আস্ত রাখতেন নাকি?

কী করবো বল! দীর্ঘশ্বাস ফেলে তানিয়া বললো, আমাদের বাড়ির অবস্থা তো তুই জানিস। মাসের শেষে এসব কেনার কথা বাবাকে বলা যাবে না।

তানিয়ার কথা শুনে পারুলের খুব খারাপ লাগলো। ওর মা মারা যাওয়ার পর পারুল আর সীমা ওদের বাড়িতে বেশ কয়েক বার গিয়েছে। দুজনই লক্ষ্য করেছে তানিয়াদের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। একটু ভেবে পারুল বললো, তুই যদি কিছু মনে না করিস তোকে আমি আমার পুরোনো প্যাস্টেলের বাক্সটা দিতে পারি । অবশ্য ওতে দুটো রঙ কম আছে। আমার ছোট ভাইটা খেলতে গিয়ে হারিয়েছে। তবে তোর ম্যাপ আঁকার কাজ চলে যাবে।

তোরটা আমাকে দিলে তুই কী দিয়ে আঁকবি?

বললাম না পুরোনোটা! গত মাসে জন্মদিনে আমি বড় দু বাক্স প্যাস্টেল উপহার পেয়েছি। ছোট ভাইটা যা পাজী! সঙ্গে সঙ্গে একটা ওর ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছে।

তানিয়া মৃদু হাসলো। পারুল বললো, রঙ পেন্সিলের বাক্সও এখন কেনার দরকার নেই। আমারটা একদিনের জন্য ধার নিস?

আজকাল তানিয়াকে কেউ ভালোবেসে দুটো কথা বললেও ওর কান্না পায়। ধরা গলায় ফিশ ফিশ করে শুধু বললো, তুই এত ভালো পারু!

তুই এত চাপা স্বভাবের হয়েছিস কেন তানিয়া? তোর মা মারা যাওয়ার পর আমার মা তোকে বলেন নি কিছু দরকার হলে আমাকে বলার জন্য?

তানিয়া কোনও কথা না বলে দুর্বা ঘাসের ডগা ছিঁড়তে লাগলো। পারুল আবার বললো, কিরে, কথা বলছিস না কেন?

তানিয়া আস্তে আস্তে বললো, কারও কাছে কিছু চাইতে আমার খারাপ লাগে। তার মানে তুই আমাকে বন্ধু ভাবিস না।

বন্ধু কেন ভাববো না! ম্লান হেসে তানিয়া বললো, তুই আর সীমা ছাড়া ক্লাসে আমার তেমন বন্ধু কোথায়?

বন্ধু যদি ভাবিস তোর কাছে কিছু চাইলে আমাকে দিবি না?

দেবো না কেন? বিব্রত গলায় তানিয়া বললো, আমার কাছে দেয়ার মতো আছেই বা কী!

থাকলে নিশ্চয় দিতি?

তা দিতাম।

তাহলে নিতেই বা আপত্তি করছিস কেন?

কিছু নিতে গেলে দিতেও হয় পারু!

এত হিসেব করে বন্ধুত্ব হয় না তানি।

তানিয়া কোনও কথা বললো না। পারুল আবার বললো, আমার জন্মদিনে তুই কী সুন্দর একটা চিঠি দিয়েছিলি, মনে আছে?

মনে থাকবে না কেন, শুকনো হেসে তানিয়া বললো, আমি কিছু দিতে পারিনি সে কথাই তো লিখেছিলাম চিঠিতে।

চিঠিতে তুই দিয়েছিলি তোর অফুরন্ত ভালোবাসা। আমার জন্মদিনে সবচেয়ে আনন্দের উপহার ছিলো ওটা।

তানিয়া হাসলো–তুই আসলেই খুব ভালো মেয়ে পারু। তাই এভাবে বলছিস।

দেড় ঘন্টা পর পারুলের ছোট চাচা ওকে নিতে এলে। এই সময়টুকু ওরা দুজন বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার কথা বলেই কাটিয়ে দিলো।

.

২. বাবার চাকুরি হারানো

তানিয়ার বাবা স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফেরেন না। স্কুলের কাছে এক বড়লোকের বখাটে ছেলেকে পড়াতে যেতে হয় ছটায়। বাড়ি ফিরতে ওঁর আটটা নটা বেজে যায়। বাবা না ফেরা পর্যন্ত তানিয়া খুব ভয়ে ভয়ে থাকে।

বছর দুয়েক আগে ওদের পাড়ার শিপলু বিপলুদের বাবা রশীদ চাচা বাড়ি ফিরতে রাত করেছিলেন। ক্লাস ফাইভে পড়া জমজ দু ভাই নটার পর থেকে পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়েছিলো, হয়তো কারও বাড়িতে ওদের বাবা আড্ডায় বসে গেছেন এই ভেবে। রাশভারি রশীদ চাচা মোটেই আড্ডা দেয়ার মতো মানুষ ছিলেন না। রাত সাড়ে দশটার দিকে এম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দে পাড়ার লোকজনের কপালে ভাজ পড়েছিলো। ভেবেছিলো কাউকে বুঝি হাসপাতালে নিতে হবে। সেই এম্বুলেন্সে রশীদ চাচার লাশ এসেছিলো হাসপাতাল থেকে। অফিসে ওভার টাইম করতে হয়েছিলো। কাজ শেষ করে বেরুতেই বড় রাস্তায় চলন্ত ট্রাকের ধাক্কা খেয়েছেন। অফিসের লোকজন ধরাধরি করে হাসপাতালে নেয়ার পথেই সব শেষ। সেই থেকে বাবার বাড়ি ফিরতে দেরি হলে তানিয়ার বুকের ভেতর ধুকপুকুনি শুরু হয়।

সেদিন তানিয়া স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখলো বাবা পেছনের বারান্দায় পুরোনো বেতের চেয়ারটায় বসে কী যেন ভাবছেন। তানিয়া কড়া নেড়েছে, বুয়া দরজা খুলে দিয়েছে, কোনও কিছু তাঁর কানে

যায়নি। বুয়া শুধু দরজা খোলার সময় চাপা গলায় তানিয়াকে বলেছে, খালুর মনে অয় শরীলডা ভালা না। কুন আওয়াজ কইরো না।

বাবার শরীর খারাপ শুনে তানিয়ার বুক কেঁপে উঠলো। ঘরে পড়ার টেবিলে বইগুলো রেখে পেছনের বারান্দায় বাবার কাছে গেলো। ভয়ে ভয়ে বললো, বাবা, তোমার কি স্ত্রীর খারাপ?

বাবা সামান্য চমকে উঠে তানিয়ার দিকে তাকালেন। ম্লান হেসে বললেন, না রে মা, শরীর খারাপ না। তুই কাছে একটু বোস।

মা মারা যাওয়ার পর বাবা কখনও এত নরম গলায় তানিয়ার সঙ্গে কথা বলেননি। আগের মতো মা বলেও ডাকেননি। বাবার কথা শুনে তানিয়ার প্রথমে ভালো লাগলেও পরে ঘাবড়ে গেলো। বাবা হঠাৎ এভাবে কথা বলছেন কেন, ও বুঝতে পারলো না। বারান্দার রঙ ওঠা লাল মেঝের ওপর বসে তানিয়া বললো, তোমার কী হয়েছে বাবা?

শুকনো হেসে বাবা কোনও রকম ভূমিকা না করে দুম করে বললেন, স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।

বলো কী বাবা? হঠাৎ চাকরি ছাড়লে কেন? বাবার কথা শুনে ভীষণ অবাক হলো তানিয়া, ভয়ও পেলো।

হঠাৎ না রে মা! কদিন ধরেই ভাবছিলাম আমার চাকরি করা উচিৎ হবে কি না।

কেন এরকম ভাবছিলে বাবা?

এ মাসের পয়লা তারিখে আমাদের স্কুলে নতুন যে হেডমাস্টার জয়েন করেছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সে রাজাকার ছিলো।

তানিয়া জানে একাত্তরে ওর বাবা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। মা থাকতে বাবা কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতেন। এক একটা কাহিনী অনেক বার শুনেছে তানিয়া। বাবার বন্ধু আশফাঁক বুকে গুলি খেয়ে বাবারই কোলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে বলেছিলেন, আমি জানি বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবে। দেশ স্বাধীন করার লড়াইয়ের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করার লড়াই অনেক কঠিন। কথা দে, তুই যদি বেঁচে থাকিস সেই কঠিন লড়াই চালিয়ে যাবি! বাবা ওঁর বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন। যতবার বাবা এই ঘটনার কথা বলেছেন ততবারই কেঁদেছেন। কখনও বিড়বিড় করে বলেছেন, আশফাঁক, তোরা দেশের জন্য একাত্তরে শহীদ হয়ে বেঁচে গেছিস। আমরা বেঁচে আছি আধমরা হয়ে। এর চেয়ে তখন মরে যাওয়া অনেক ভালো ছিলো।

বাবার কথা শুনে তানিয়া কী বলবে ভেবে পেলো না। চুপচাপ শুধু বসে থাকলো। বাবা বললেন, লোকটা এসেই বললো, এ্যাসেম্বলির সময় রোজ রোজ জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে কেন? পতাকাই বা তুলতে হবে কেন? ওসব বিশেষ দিবস টিবসে মানায়, রোজ রোজ করতে হবে না। আমিও শুনিয়ে দিয়েছি দুকথা!

তানিয়া বললো, স্কুলের অন্য টিচাররা কিছু বলেননি?

ম্লান হেসে বাবা বললেন, সবাই জানে এই হেডমাস্টার স্কুল কমিটির নতুন সেক্রেটারির ভাই। গত ঈদে সেক্রেটারি মোটা টাকা ডোনেশন না দিলে কারও বেতন হতো না। সেক্রেটারিও জামাত করে।

তার মানে তোমাদের স্কুলে এখন জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয় না? জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না?

কোনও কথা না বলে বাবা শুধু মাথা নাড়লেন। তানিয়া আবার বললো, স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছাত্ররাও কিছু বলেনি?

তিক্ত গলায় বাবা বললেন, বাড়িতে বাপ মার কাছে দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা পেলে তো বলবে? স্কুলে, বাড়িতে সবখানে এক অবস্থা!

তুমি যে চাকরি ছাড়লে—সামাদ চাচা, জাফর চাচা কেউ কিছু বলেননি?

বারণ করেছিলো অনেকে। আমি বলেছিলাম, চলুন সবাই মিলে শিক্ষা দফতরে চিঠি লিখি। সাংবাদিকদের বলে খবরটা কাগজে তুলে দিই। কেউ রাজি হলো না। সবারই চাকরি হারাবার ভয়!

তানিয়া কোনও কথা বললো না। একটু চুপ থেকে বাবা আবার বললেন, আশফাঁককে কথা দিয়েছিলাম স্বাধীনতা রাখার জন্য লড়বো। দেশে যখন রাজাকারদের মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বানানো হলো তখন কিছু বলিনি। স্বাধীনতার শত্রুরা যখন মিটিঙ মিছিল করে তখনও কিছু বলি না। স্কুলের ঘটনাটা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। বল, এভাবে আর কত দিন পড়ে পড়ে মার খাবো?

তানিয়া বলতে চাইলো, বাবা, তুমি চাকরি ছেড়েছে। সংসার কিভাবে চলবে তুমি ভাবোনি। রাজাকার হেডমাস্টারও তার জায়গায় থেকে গেলো। আরও কিছু কথা তানিয়ার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। ও ভালোভাবেই জানে এসব কথা শুনলে বাবা কষ্ট পাবেন। চাকরি ছাড়তে বাবার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে। এখন দরকার বাবাকে সান্ত্বনা দেয়া, সাহস দেয়া। মা বেঁচে থাকলে তাই করতেন।

তানিয়া আস্তে আস্তে বললো, তুমি ঠিক কাজ করেছো বাবা। রাজাকাররা দেশ চালাবে এটা দেখার জন্য নিশ্চয় তোমরা মুক্তিযুদ্ধ করোনি!

তানিয়ার কথা শুনে বাবার বুক গর্বে ভরে গেলো। স্কুলের হেড মৌলবি প্রায়ই আড়ালে ইয়ার্কি মারেন–দাদার আমলে ঘি খেয়েছেন, এখনও হাতে গন্ধ শোকেন। কখনও বলেন, দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন না দেশটাকে ইণ্ডিয়ার কাছে বেচে দেয়ার জন্য যুদ্ধ করেছেন সেটাই তো ভেবে দেখা দরকার। আবার কখনও বলেন, পাকিস্তান যদি না ভাঙতে আমাদের এই দুর্গতি হতো না। হেড মৌলবির এসব কথা সব টিচারের ভালোও লাগে না। তবু সবাই চুপ করে থাকেন। তবে বাবার সামনে হেড মৌলবি এসব কথা বলেন না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর তানিয়া আস্তে আস্তে বললো, এখন কী করবে কিছু ভেবেছো বাবা?

মাথা নেড়ে সায় জানালেন বাবা, আমাদের রত্নেশ্বরীর গ্রামের বাড়িতে জমি জমা যা আছে–দেখি সেখানে থেকে ছোট খাট একটা খামার করা যায় কিনা। গত বছর তোর মা মারা যাওয়ার পর বিভূতিও বলছিলো গ্রামে গিয়ে থাকতে। তোকে মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী হোমস-এ ভর্তি করে দেবো। স্কুলের হোস্টেলে থাকবি। মাসে দুবার এসে দেখে যাবো।

ওখানে তো পড়ার অনেক খরচ বাবা?

তোর মা মারা যাওয়ার পর জয়াদির সঙ্গে একবার কথা বলেছিলাম। বলেছিলেন মির্জাপুরের মেয়ে হিসেবে তোর বেতন আর হোস্টেল খরচ অর্ধেক করে দিতে পারবেন। পরে ভেবে দেখলাম, একা থাকতে তোর কষ্ট হবে। তাই তখন আর ভর্তি করাইনি।

তানিয়া বাবার কোলে মাথা গুঁজে বললো, একা থাকতে তোমার কষ্ট হবে না বাবা?

মেয়ের নরম চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বাবা বললেন, কষ্ট হলেও এ ছাড়া উপায় কী মা! গ্রামে যে স্কুল আছে সেটা তো ছেলেদের!

বাবাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে ভেবেও এত নামী স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে–তানিয়ার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। বললো, ক্লাস তো শুরু হয়ে গেছে বাবা। এখন কি আমাকে নেবে?

জয়াদিকে বুঝিয়ে বললে নেবেন। আমি কাল পরশু গিয়ে কথা বলে আসবো। যেতে যখন হবেই–ভাবছি এ মাসেই চলে যাবো।

.

পরদিন স্কুলে এসে সবার আগে পারুলের সঙ্গে কথা বললো তানিয়া। পারুল ম্লান হেসে বললো, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তানি! সত্যিই চলে যাবি?

বাবা তো তাই বললেন। নামী স্কুলে পড়ার আনন্দের পাশাপাশি সাত আট বছরের পুরোনো বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়ার কষ্টও তানিয়ার কম ছিলো না। বাবার চাকরি হারাবার কষ্টও ভুলতে পারছিলো না ও।

কবে যাবি ঠিক হয়েছে? জানতে চাইলো পারুল।

এ মাসের ভেতরই। বাবা আজ মির্জাপুর গেছেন খোঁজখবর আনার জন্য।

ক্লাস সিক্সে থাকতে সুমনা গিয়েছিলো। এবার যাচ্ছিস তুই।

সুমনা যে ক্লাস টেন পর্যন্ত থাকবে না এটা তানিয়ারা আগে থেকেই জানতো। ওর বাবার ছিলো বদলির চাকরি। তানিয়ার যাওয়াটা ওর বন্ধুদের সবার কাছেই একটা দুর্ঘটনার মতো মনে হলো। ক্লাসের পরীক্ষায় তানিয়া দশের ভেতর থাকতে পারে না এটা সত্যি, কিন্তু গান, আবৃত্তি আর খেলাধুলোয় শুধু ক্লাসে নয় স্কুলের সবাই ওকে এক ডাকে চেনে। গত চার বছর স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে তানিয়া তিন চারটা গান না গেয়ে স্টেজ থেকে নামতে পারেনি, যদিও অন্যরা একটার বেশি গাওয়ার সুযোগ পায়নি। তানিয়ার মা নিজে গাইতে পারতেন। তারপরও ওকে বুলবুল একাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে গত তিন বছর ধরে তানিয়া ফার্স্ট হচ্ছে।

টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসের ভেতরই তানিয়ার বন্ধুরা সবাই ওকে ঘিরে বসলো। অনেকেরই বিশ্বাস হচ্ছিলো না, তানিয়া হঠাৎ করে এভাবে চলে যাবে। ক্লাসের মনিটর রেহানা তানিয়ার খুব কাছের বন্ধু নয়, বড়লোকের মেয়ে বলে তানিয়াও ওকে এড়িয়ে চলে। সেই রেহানাও বললো, তুই চলে গেলে আমাদের স্কুলে ফাংশনের কী হবে?

লিলির বাবা রাজনীতি করেন। সরকারী দলের হোমরা চোমরা একজন। ও বললো, বাবাকে বলতে পারি তোর বাবার স্কুল কমিটিকে বলার জন্য যেন র চাকরি না যায়।

তানিয়া জানে লিলির বাবার সে ক্ষমতা আছে। বললো, স্কুল কমিটি তো বাবাকে চাকরি ছাড়তে বলেনি। বাবা নিজে রিজাইন দিয়েছেন।

লিলি তবু বললো, হেডমাস্টারটার জন্যেই তো তোর বাবা চাকরি ছেড়েছেন। হেডমাস্টারকে বরখাস্ত করাও কঠিন কোনও কাজ নয়।

তানিয়া মাথা নাড়লো–বাবার জন্য কারও চাকরি যাবে এটা তিনি পছন্দ করবেন না।

সীমা বললো, তানিয়া যখন চলেই যাবে ওর জন্য আমরা সবাই মিলে ফেয়ারওয়েল পার্টি দেবো।

সবাই কোরাসে সীমার কথায় সায় জানালো। তানিয়া লজ্জা পেয়ে বললো, আমার জন্য ফেয়ারওয়েল পার্টি করতে হবে কেন?

সীমা বললো, তুই কথা বলবি না।

রেহানা গম্ভীর গলায় পারুলকে বললো, তুই তানিয়াকে নিয়ে বাইরে যা। আমরা নিজেরা একটু পরামর্শ করবো।

পারুল একটু হেসে তানিয়ার হাত ধরে বললো, চল, তোকে আজ ফুচকা খাওয়াবো।

মা মারা যাওয়ার পর থেকে তানিয়া নিজেকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে নিয়েছিলো। ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চে বসে, বন্ধুদের বাড়িতেও খুব একটা যায় না–হঠাৎ নিজেকে ওর গুরুত্বপূর্ণ একজন মনে হলো। ক্লাসের মেয়েরা ওকে নিয়ে আলোচনা করছে ভাবতেই বুকটা আনন্দে ভরে গেলো।

ঘন্টা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ক্লাসে ঢুকলো ওরা দুজন। সীমাদের মিটিঙ তখন শেষ হতে চলেছে। রেহানা বললো, আগামী শুক্রবার দুপুরে সীমাদের বাড়িতে পার্টি হবে তানিয়ার জন্য।

পারুল বললো, শুক্রবার মানে তো পরশু?

হ্যাঁ, পরশু শুক্রবার। সীমা গিয়ে তানিয়াকে নিয়ে আসবে। তোর বাবা নিশ্চয় আপত্তি করবেন না?

কাকের কথা বাদ দিলে বাবার যে মেজাজ গত এক বছর ধরে তানিয়া দেখছে তাতে ওর ভয়ই ছিলো ওকে বোধহয় পার্টিতে যেতে দেবেন না। তানিয়া যখন রাতে খাবার সময় ফেয়ারওয়েল পার্টির কথা বাবাকে বললো, শুনে তিনি খুশিই হলেন–বেশ তো যাবি! স্কুলে। আমার বন্ধুরাও চেয়েছিলো আমাকে ফেয়ারওয়েল দিতে। আমি মানা করেছি। কোনও অনুষ্ঠান করলে রাজাকার হেডমাস্টারটাই সভাপতি হবে। কী দরকার সে অনুষ্ঠানে যাওয়ার!

.

শুক্রবার সকাল নটায় সীমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ালো তানিয়াদের গলির মুখে। বড় গাড়ি ওদের সরু গলিতে ঢোকে না। সীমাও এসেছিলো গাড়ির সঙ্গে। তানিয়া অবাক হয়ে বললো পার্টি তো দুপুরে। এত সকালে এসেছিস কেন?

সীমা বললো, পার্টি কি শুধু খাওয়ার জন্য? তোর বাবা কোথায়? আজ সারাদিন তোকে রেখে দেবো।

তানিয়া হেসে বললো, বাবা ভোরে মির্জাপুরে আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

তাহলে আর চিন্তা কি! বুয়াকে বলে চল জলদি।

জলদি বললে হবে না। বুয়া বাজারে গেছে। ফিরতে আরও আধ ঘন্টার কম নয়। তুই বোস।

সীমার স্বভাব চড়ুই পাখির মতো। চুপচাপ বসে থাকা ওর স্বভাবের বাইরে। বললো, তুই তাহলে রেডি হয়ে নে। ততক্ষণে আমি বরং মিলিকে তুলে আনি। বলে আর ও অপেক্ষা করলো না।

তানিয়া ওর ঘরে ঢুকে আলমারির ভেতর থেকে ওর সবচেয়ে প্রিয় পোশাকটা বের করলো। মা মারা যাওয়ার এক মাস আগে নিজের হাতে বানিয়েছিলেন। হালকা বেগুনি রঙের ভেতর সাদা হাজারি বুটির দামী একটা জামদানি শাড়ি ছিলো মার। মাত্র একবার পরেছেন, রিকশার খোঁচা লেগে বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিলো। সেই শাড়ি দিয়ে মা ওকে ঘন কুচি দেয়া লম্বা ঝুলের কামিজ বানিয়ে দিয়েছিলেন। আঁচলের ঘন নকশার খানিকটা বুকের কাছে, বাকিটা ওড়নার দুই মাথায় কেটে বসিয়েছিলেন। মার নিজের হাতে বানানো কামিজের সেটটা পরলো তানিয়া।

এক ঘন্টা পর সীমা এসে তানিয়াকে দেখে চোখ কপালে তুললো–তানি তোকে একটা পরির মতো লাগছে। কী দামী ড্রেস পরেছিস? কোত্থেকে কিনেছিস বলতো?

কিনিনি। মা বানিয়ে দিয়েছেন। বলতে গিয়ে তানিয়ার গর্ব হলো।

নিজের জিনস-এর প্যান্ট আর টপস-এর দিকে তাকিয়ে সীমা বললো, তোর পাশে আমাকে চাকরানির মতো লাগছে।

মোটেই না সীমা। তোকে খুব স্মার্ট লাগছে।

সীমাদের পার্টিতে সবাই তানিয়ার পোশাকের প্রশংসা করলো। তিন চার জন ছাড়া ক্লাসের সব মেয়েই এসেছিলো সীমাদের বাড়িতে। সীমার মা প্রায়ই তাঁর তিন ছেলেমেয়ের বন্ধুদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়ান। তার একটা মাত্র শখ, আর তা হলো দেশ বিদেশের রকমারি রান্না। সুযোগ পেলেই প্রাণ ভরে মিটিয়ে নেন।

ক্লাস মনিটর রেহানা ঠিক করেছিলো সবাই মিলে চাঁদা তুলে পার্টি করবে। সীমার মা শোনা মাত্র নাকচ করে দিয়েছেন। ধরা গলায় রেহানাকে বলেছেন, মা মরা মেয়েটা স্কুল ছেড়ে, তোদের সবাইকে ছেড়ে একেবারে চলে যাচ্ছে। এক বেলা তাদের খাওয়াতে পারবো না আমাকে এমন ছোটলোক ভাবছিস কেন?

জিব কেটে রেহানা বলেছে, ছিঃ খালাম্মা, আপনাকে ছোটলোক ভাববো কেন? আমরা চেয়েছিলাম তানিয়ার জন্য আমরা সবাই কিছু করি।

সীমার মা মুখ টিপে হেসে বলেছেন, তোদর বাজেট কতো?

মাথা পিছু পঞ্চাশ ঠিক করেছিলাম। কয়েকজন অবশ্য কম দিয়েছে। সব মিলিয়ে নয়শ চল্লিশ টাকা উঠেছে।

ঠিক আছে। এ টাকা দিয়ে তানিয়াকে আমরা চমৎকার উপহার কিনে দেবো।

সারাদিন সীমাদের বাড়িতে মেয়েরা হুল্লোড় করে কাটালো। বিকেলে চায়ের পর্ব শেষ হওয়ার পর তানিয়াকে গান গেয়ে শোনাতে হলো। একেক জনের পছন্দ মেটাতে গিয়ে বারোটা গান গাইতে হলো ওকে। গান শুনে সীমার রাশভারি বাবাও গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার গলায় সুর আছে, দরদও আছে। গানের চর্চা ছেড়ো না।

সবার প্রশংসা শুনতে শুনতে তানিয়ার বার বার কান্না পাচ্ছিলো। সব শেষে রেহানা যখন বিদায় জানিয়ে দুঃখভরা গলায় ছোটখাট একটা বক্তৃতা করলো, তানিয়া চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না। রাতে বাড়ি ফেরার সময় উপহার হিসেবে ওকে যখন জিনস-এর স্কার্ট-টপস সেট, প্যাস্টেল রঙের বড় বাক্স, রঙিন পেন্সিল, জলরঙের বাক্স আর মোটা ড্রইং খাতা দেয়া হলো তানিয়া আরেক দফা কাঁদলো।

০৩-৪. নিজেদের অচেনা বাড়ি

৩. নিজেদের অচেনা বাড়ি

অনেকটা পথ বাসে, এরপর রিকশায়, সবশেষে এক ঘন্টা নৌকায়-রত্নেশ্বরীর বাড়ির আঙিনায় পা ফেলার আগেই ঝুপ করে অন্ধকার নামলো। মাঘ মাসের সন্ধ্যা দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে যায়।

তানিয়ার বাবা বিয়ের পরই গ্রামের বাড়ি ছেড়েছেন। বছরে একবার এসে ধান বিক্রির টাকাটা নিয়ে যান। তাঁর দূর সম্পর্কের এক চাচাতো ভাই পাশের বাড়িতে থাকেন। তিনিই তানিয়ার বাবার জমিটুকু চাষ করান।

তানিয়া খুব ছোটবেলায় একবার গ্রামের বাড়িতে এসেছিলো। মা আসতে চাইতেন না বলে ওরও আর আসা হয়নি। গত সপ্তায় বাবা যখন ঠিক করলেন গ্রামের বাড়িতে চলে আসবেন তখন তানিয়াকে বলেছিলেন, মেঝে পাকা বটে, ঘরটা টিনের। ইলেকট্রিসিটি নেই, হারিকেন আর কুপির আলোয় রাতের কাজ সারতে হয়। রাতে শেয়াল ডাকে, গরমের সময় উঠোনে সাপ বেরোয়, ঘাসের ভেতর ছিনে জেঁক কিলবিল করে–পারবি তো থাকতে? বাড়ির বর্ণনা শুনে তানিয়া খানিকটা দমে গেলেও শুকনো হেসে বাবাকে বলেছে, কেন পারবো না বাবা? গ্রামে বুঝি মানুষ থাকে না!

নৌকা থেকে নামার পরই মাগরেবের আজান শুনেছিলো তানিয়া। মাইক ছাড়া কফ জড়ানো গলায় খালের কিনারের মসজিদের আঙিনায় দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো হুজুর আজান দিচ্ছিলেন। মসজিদ বলতে তানিয়া সব সময় যে রকম দেখেছে–পাকা গম্বুজওয়ালা নানা রঙের সিরামিকের টুকরো বসানো ফুল

লতা পাতার নকশা করা, তেমন কিছু নয়। মাটির মেঝেতে হোগলা পাতার মাদুর বিছানো, বেড়ার ঘর, চালে টিন। মুসল্লিও ছয় সাত জনের বেশি নয়।

আজানের শব্দ শুনে বাবা চাপা গলায় তানিয়াকে বলেছেন, মাথায় ওড়না দাও।

আসার সময় তানিয়া জিনস-এর স্কার্ট পরতে চেয়েছিলো। বাবা বারণ করেছেন–এসব পোষাক স্কুলে পরবে। গ্রামে সালোয়ার কামিজ আর ওড়না পরবে।

তানিয়া মাথায় ঘোমটা টেনে পেছনে তাকিয়ে দেখলো, বুয়ার মাথায়ও মস্ত ঘোমটা।

ঢাকার বাড়ি ছাড়ার আগে ঘরের জিনিষপত্র বেশির ভাগই বাবা বিক্রি করেছেন। খুব দরকারী যেগুলো সেগুলো গত কাল ট্রাকে আর নৌকায় নিয়ে এসেছিলেন। বাবা, তানিয়া আর বুয়ার হাতে ছিলো ওদের কাপড় চোপড়ের তিনটা স্যুটকেস।

মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বয়স্ক একজন বাবাকে বললেন, নূরউদ্দিন আসলা বুঝি! ওইটা কে, তোমার মেয়্যা?

বাবা যেতে যেতে শুধু বললেন, হ কাকা?

গ্রামের বাড়িতে আসার কথা শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলো বুয়া। তানিয়াকে সুযোগ পেলেই বুঝিয়েছে শহরের থেইকা গেরামে অনেক ভালা থাকবা। তোমাগো পুকুরে কত মাছ! তরি তরকারি গাছ থনে তুইলা খাইবা।

বুয়ার খুশি হওয়ার কারণ ছিলো–এ গ্রামেই ওর বাড়ি। ওর ছেলে কালা বউ আর নাতি নাতনি নিয়ে গ্রামেই থাকে। কালা কামলার কাজ করে। ওর বউটা ভালো নয়। বিয়ের পর ছেলে বউয়ের কথায় ওঠে আর বসে। এসব কথা বুয়া বহুবার তানিয়াকে বলেছে। বুয়াকে যখন বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী কালার মা বুয়া, শহর ছাইড়া থাকতে পারবা? তুমি তো গেরামে থাকতে চাও না?

বুয়া জিভ কেটে বলেছে, খালু যে কী কন! বউয়ের জ্বালায় গেরাম ছাড়ছিলাম, পোলার সংসারে থাকুম না বইলা। আমি অহন নিজে কামাই কইরা খাই। দেইখেন বউ আইসা আমারে তোয়াজ করবো।

নৌকা থেকে নেমে মিনিট দশেক হাঁটতে হয়েছে ধান ক্ষেতের সরু আলের ওপর দিয়ে। আলের ওপর হাঁটতে বাবা আর বুয়ার অসুবিধে না হলেও তানিয়ার কাছে ধান কাটা, ঘন সাদা কুয়াশা জমা শুকনো ক্ষেতের ওপর দিয়ে হাঁটাটাই বেশি নিরাপদ মনে হয়েছে। তবে নৌকা থেকে নামার পরই কনকনে শীত ওর পুলোভার ফুটো করে ভেতরে ঢুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিলো।

বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে বাবা গলা তুলে ডাকলেন, আজিমউদ্দিন কই রে!

লম্বা ঘোমটা টানা একজন মহিলা হারিকেন হাতে বেরিয়ে এসে মুখ ঘুরিয়ে বাবাকে বললেন, আপনেগো দেরি দেইখা তাইনে হাটে গেছে। আইসা পড়বো।

হারিকেনের আলোয় বাবা বারান্দায় উঠে মাঝের ঘরের তালা খুললেন। ঘোমটা টানা মহিলা ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর হারিকেন রাখলেন। বাবা তানিয়াকে বললেন, তোমার চাচী, সালাম করো।

তানিয়া এগিয়ে এসে চাচীর পা ছুঁয়ে সালাম করলো। চাচী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাইচা থাকো মা।

বুয়া ভেতরে ঢুকে বললো, অ খালা, আমারে আগে পাকঘর দেখাও। জলদি পাক তুইলা দেই।

চাচী বাবাকে বললেন, আইজ রাইতে আপনেরা আমাগো বাড়িতে খাইবেন। কাইল সকালেও। কালার মা কাইল নাশতা কইরা পাক বসাইও।

বুয়া এক গাল হেসে বললো, আল্লায় আপনের ভালা করুক খালা। আমার ভাত না খাইলেও চলে, তয় পান ছাড়া চলে না।

দরজার পাশে চাদর গায়ে দুটো আট দশ বছরের ছেলে মেয়ে উঁকি মেরে তানিয়াদের দেখছিলো। চাচী ডাকলেন, অই রাজন লাইলি ওইহানে খাড়াইয়া রইছস ক্যান। ঘরে আইসা চাচা আর বুজিরে সালাম কর। বাদে কালার মা বুয়ার লাইগা পান আইনা দে।

বড়টি লাইলি, ছুটে এসে ঝুপ ঝুপ করে বাবা আর তানিয়াকে সালাম করলো। তানিয়াকে আজ পর্যন্ত কেউ পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেনি। ছোট রাজন লাজুক পায়ে যখন সালাম করতে ঘরে ঢুকলো তানিয়া ওর হাত ধরে বললো, না, না, সালাম করতে হবে না। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো রাজন?

কেলাশ টুতে। লজ্জা জড়ানো গলায় বললো রাজন।

লাইলি কোন ক্লাসে পড়?

আমি পড়ি কেলাশ ফোরে বুজি। চটপটে উত্তর দিলো লাইলি।

লাইলির কথা শুনে মজা লাগলো তানিয়ার। ওকে আজ পর্যন্ত কেউ বুজি বলে ডাকেনি। ছোট খালার ছেলেমেয়েরা কিংবা মামার ছোট মেয়েটা ওকে তানিয়া আপু বলে। নিচের ক্লাসের মেয়েরাও আপা বলে। ওদের ক্লাসে পড়ে আরতি। আরতির ছোট বোন ক্লাস ফোরে পড়ে। ও বলে তানিয়াদি। তানিয়ার হাত ধরে লাইলি বললো, বুজি, চল, আমাগো বাড়িতে চল।

বুয়া বললো, এতখানি পথ আইছি, একটু জিরাইয়া লই। যামুনে একটু পরে।

চাচী নিচু গলায় বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইজান, আপনেরে একটু চা দেই?

বাবা বললেন, দিতে পারেন।

চায়ে দুধ দিমু না আদা তেজপাতা দিমু?

বুয়া বললো, খালু খায় লেম্বু চা। লেম্বু না থাকলে হুদা লাল চা। লন আমি বানায়া দিমু। তানিও একটু চা পাইলে মনে অয় খুশি ওইবো।

চাচী বুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাজন আর লাইলিকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ওদের কথা বলার শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ পাথরের মতো নিথর শব্দহীন হয়ে গেলো। একেবারে শব্দহীন বলা যাবে না, মাঝে মাঝে ঝি ঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছিলো।

জানালার বাইরে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। ঘরের ভেতরও হারিকেনের আলো যেখানে পৌঁছোয়নি সেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। বাবা খাটে বসে তানিয়াকে বললেন, আয় বোস। কেমন লাগছে রে মা?

তানিয়া ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললো, কাল পরশু তোমার অনেক খাটুনি গেছে বাবা, তাই না? ঘরের জিনিষপত্র সব জায়গা মতো গুছিয়ে ফেলেছো?

বাবা মৃদু হেসে বললেন, দুটো কামলা ছিলো, তোর আজিমুদ্দিন চাচা ছিলো। কোনও অসুবিধে হয়নি। পেছনের বারান্দায় বেড়া দিয়ে ঘিরে তোর জন্য একটা বাথরুম বানিয়ে দিয়েছি। হাত মুখ ধুয়ে নিতে পারিস।

তা না হয় যোব। তুমি আমার জন্য বাথরুম বানাতে গেলে কেন বাবা? আমি তো পরশু স্কুলে চলে যাবো।

স্কুলে লম্বা ছুটি হলে তোকে বাড়িতে আসতে হবে। এক মাস পরই রোজার বন্ধ শুরু হচ্ছে।

বাবার পাশে খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে তানিয়া বললো, বুয়া বলে দেশের এই চাচা নাকি ভালো না, তোমাকে জমি নিয়ে ঠকিয়েছে। চাচীকে তো ভালো মনে হলো বাবা। ছেলেমেয়ে দুটোও বেশ দেখতে।

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, জমি জমার বিষয় নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। পেছনের বারান্দায় গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এসো। বালতিতে পানি আছে।

বাবার কথা শুনে তানিয়ার সব উচ্ছ্বাস কর্পূরের মতো উবে গেলো। ম্লান মুখে উঠে পড়লো। ওর চেহারার পরিবর্তন দেখে বাবার মনে হলো এভাবে বলাটা ওঁর উচিৎ হয়নি। তাঁর চাচাতো ভাইটি যে সুবিধের নয় এটা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। গ্রামের বাড়িতে কদিন থাকলে তানিয়াও টের পাবে।

ওকে বললেন, হারিকেন নিয়ে যাও মা। চাচা ভালো না হলে কি হবে, ভাই বোনরা তো তোমাকে পছন্দ করেছে।

বাবার নরম গলা শুনে তানিয়ার মন ভালো হয়ে গেলো। সুটকেস খুলে তোয়ালে আর সাবান বের করে বাবাকে বললো, হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে।

বাবা মৃদু হেসে বললেন, শহরের চেয়ে গ্রামে শীত বেশি লাগে।

মুখ ধোয়ার সময় তানিয়ার মনে হলো বরফ গলা পানিতে ও হাত ডুবিয়েছে। ও এমনিতে শীত কাতুরে। কোন রকমে মুখে পানির ঝাঁপটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেললো। বুয়াকে আজই বলতে হবে–কাল যদি গরম পানি না দেয় ওর মুখ ধোয়া, গোসল করা কিছুই হবে না।

ঠাণ্ডার ভেতর বুয়ার বানানো লেবুর রস দেয়া চা খেতে তানিয়ার দারুণ লাগলো। বাবাও খুব তৃপ্তি করে চা খেলেন।

রাতে ওরা যখন পাশের বাড়িতে খেতে গেলো তখনই লাইলি রাজনের বাবা হাট থেকে ফিরলেন। বাবাকে দেখে লম্বা সালাম দিয়ে বললেন, ভাইজানের দেরি দেখে একটু হাটে গেছিলাম।

বুয়ার চোখের ইশারা পেয়ে তানিয়া চাচার পা ছুঁয়ে সালাম করলো। চাচা দরাজ গলায় বললেন, আল্লা তোমার হায়াত দারাজ করুক মা।

ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে খেতে দেয়া হয়েছে তানিয়াদের। চাচা আর রাজন শুধু ওদের সঙ্গে বসেছে। অনেক বলেও লাইলিকে বসাতে পারেনি তানিয়া।

খেতে খেতে বাবা বললেন, অবেলায় হাটে কী কিনতে গেছিলা আজিমউদ্দিন?

কিছু কিনতে না ভাইজান। একটা মিটিং ছিলো। জবাব দিলেন চাচা।

কিসের মিটিঙ?

গ্রামে একটা ওয়াজ মাহফিল হইবো। তারই এন্তেজামের জইন্য মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হুজুর মিটিঙ ডাকছিলেন।

ওয়াজ করতে পয়সা লাগে না?

খুব লাগে। এক লাখ টাকার বাজেট হইছে।

কও কী আজিমউদ্দিন! এত টাকা কই পাইবা?

আল্লার কামে কী টাকার ঠ্যাকা হয়! গ্যারামের মাইনষে দিবো। চেয়ারম্যান সাবেই তো দশ হাজার ককুল করছেন।

চেয়ারম্যান মানে ওই রাজাকার ইমানালী?

হ ভাইজান। গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন চাচা।

বাবা একটু পরে বললেন, আশেপাশে তিন চাইর গেরামে মেয়্যাগো একটা হাই ইশকুল নাই। ওয়াজের পিছে টাকা খরচ না কইরা ওই ট্যাকা দিয়া একটা গার্লস ইশকুল করলে তো পারো।

ইশকুল করবো সরকারে। আমরা ওয়াজ করুম সোয়াব কামানের লাইগা। আপনে মেয়্যাগো ইশকুল বানানোর কথা আগেও কইছেন। হেয়্যা কোন সোয়াবের কাম না, গুনার কাম।

কী পাগল ছাগলের মতো কথা বল আজিমউদ্দিন। ইশকুল করন গুনার কাজ হইবো ক্যান?

ভাইজান বেয়াদবি মাফ কইরেন। আমি এই সকল বিষয়ে আপনের লগে কতা কইতে চাই না।

বাবা আপন মনে বললেন, তুমি আর মানুষ হইলা না!

চাচার কথা চেহারা পোষাক কিছুই ভালো লাগে নি তানিয়ার। গায়ের রঙ কালো, দাঁত উঁচু। থুতনিতে এক মুঠো কাঁচা পাকা ছাগুলে দাড়ি অথচ গোঁফ কামানো। মাথায় গোল টুপি, গলায় সাদার ভেতর কালো চেক বড় রুমাল ঝোলানো। পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটুর নিচে থেমেছে অথচ লুঙ্গি পরেছেন গোড়ালির এক বিঘত ওপরে।

খেয়ে উঠে চাচা বিরাট ঢেকুর তুলে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ!

খাওয়ার পর বাবা দেরি করলেন না। চাচীকে বললেন, লাইলির মা, যাই । আপনার রান্না খুব ভালো হইছে।

চাচী ফিশ ফিশ করে বললেন, ভাইজান পান খাইবেন না?

না, আমি পান খাই না। পান কালার মা বুয়ারে দিয়েন।

ঘরে এসে বাবা তানিয়াকে বললেন, তোমার চাচা জমি জমা নিয়ে আমাকে কিভাবে ঠকাচ্ছে ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার খারাপ লাগে, আমারই ভাই হয়ে

আজিমউদ্দিন জামাতীদের সঙ্গে ওঠাবসা করে। বলে কিনা স্কুল করা গুনার কাজ!

তানিয়া বললো, যখন গ্রামে থাকবে ঠিক করেছো তখন তুমিই তো পারো গ্রামে একটা মেয়েদের স্কুল খুলতে!

আমার টাকা থাকলে ঠিকই খুলতাম।

গ্রামের সবাই নিশ্চয় চাচার মতো নয় বাবা। তোমার সঙ্গে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাঁরা কোথায়? তাদের বলো টাকা দিতে।

ভালো বলেছিস মা! আমাদের সঙ্গে যারা যুদ্ধে গিয়েছিলো তাদের অনেকে বেশ টাকা পয়সা বানিয়েছে। দেখি ওদের বলে যদি রাজী করাতে পারি। সামনের বছর আজিমউদ্দিনের মেয়ে লাইলিই তো স্কুলে যেতে পারবে না। প্রাইমারি স্কুলে এটাই ওর শেষ বছর।

বুয়া বললো, বাপ বেটি কী সারা রাইত পুটুর পুটুর করবো? ঘুমান লাগবো না?

ঢাকার বাড়ির মতো এখানেও তানিয়ার পাশের ঘরে বাবা নিজের খাট পেতেছেন। মা মারা যাওয়ার পর থেকে বুয়া তানিয়ার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোয়। বেচারি বেশি রাত জাগতে পারে না। আজ অবশ্য খাটুনিও কম যায়নি। সন্ধ্যার পর থেকেই বুয়ার হাই উঠছিলো।

কাপড় বদলে তানিয়া বিছানায় ওর কম্বলের নিচে ঢুকলো। বুয়া গায়ে দেয় ভীষণ ভারি একটা লেপ। লেপটা পুরোনো হলেও খুব যত্ন করে বুয়া। রোজ রোদে দেয়, শীত চলে গেলে ন্যাপথলিন আর নিমপাতা দিয়ে সিন্দুকে তুলে রাখে।

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুয়া মিহি শব্দে নাক ডাকতে লাগলো। তানিয়া জানে এক ঘন্টা পরই শুরু হবে বিকট শব্দে নাক ডাকানো। নিজের পরিচিত বিছানা হওয়া সত্ত্বেও জায়গা বদলের জন্য তানিয়ার ঘুম আসছিলো না। তার ওপর বাইরে অসংখ্য ঝিঁঝির ডাক কাণে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিলো। মাঝে মাঝে অনেক দূরে হুক্কা হুয়া করে শেয়াল ডাকছিলো। পুরোনো ঢাকার বাড়িতে ট্রাকের আর গাড়ির শব্দ, অনেক রাত পর্যন্ত গলিতে লোকজনের হই হুল্লার শব্দ এর চেয়ে অনেক বেশি হলেও তানিয়ার ঘুমোতে অসুবিধে হয়নি।

হারিকেনের আলো কমিয়ে বুয়া টেবিলের নিচে রেখেছে। বাইরে সন্ধ্যার পর যতটা অন্ধকার ছিলো এখন অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ উঠেছে। তানিয়া তাকিয়েছিলো খোলা জানালার দিকে। ঘরের দেয়াল বাঁশের বেড়া দিয়ে বানানো হলেও কাঠের ফ্রেমের জানালায় লোহার শিক লাগানো।

হঠাৎ ওর চোখে পড়লো জানালার বাইরে দুটো কালা ছায়ামূর্তি। ভূত বিশ্বাস না করলেও তানিয়া ভয় পেলো। চোর ডাকাত নয়তো? হাতের কনুই দিয়ে বুয়াকে গুঁতো দিলো। বার তিনেক গুঁতো খেয়ে বুয়া বললো, কী ওইছে তানিয়া? ঘুমাও নাই?

বুয়ার কথা শুনে ছায়ামূর্তি দুটো সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তানিয়া বললো, জানালার বাইরে কারা যেন ঘোরাফেরা করছে।

বুয়া ভয় পাওয়া গলায় বললো, জানালার বাইরে কারা ঘুরবো? কী না কী দেখছো, অহন ঘুমাও।

বুয়া তিনবার কুলহুয়াল্লা পড়ে নিজের আর তানিয়ার বুকে ফুঁ দিলো। তানিয়া বললো, জানালাটা বন্ধ করে দাও বুয়া।

বুয়া বললো, আমি তো বন্ধ করতে চাইছিলাম। খালু কইলো ঘর মেলা দিন বন্ধ আছিল। আইজ জানালা খোলা থাউক।

না বুয়া, বন্ধ করে দাও।

কথা না বাড়িয়ে বুয়া জানালা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকা আরম্ভ করলো।

.

৪. রাতে কারা আসে

তানিয়া ঘুমিয়েছিলো অনেক রাতে। শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলো, ওদের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় দারুণ সুন্দর একটা মেয়েদের স্কুল। নীল সাদা ইউনিফর্ম পরে ছোট ছোট মেয়েরা ছুটোছুটি করছে। মরিয়ম আপার মতো চশমা পরে তানিয়া ক্লাসে ভূগোল পড়াচ্ছিলো। বললো, কে কে হোমওয়ার্ক আননি উঠে দাঁড়াও। ওর কথা শুনে করুণ মুখে লাইলি উঠে দাঁড়ালো। মরিয়ম আপার মতো তানিয়া বলতে যাবে–ইউ নটি গার্ল হোমওয়ার্ক কেন করোনি, তখনই বুয়া ঢং ঢং করে ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দিলো। মেয়েরাও সবাই দুদ্দাড় করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলো।

ভোরে বুয়ার ডাকে তানিয়ার ঘুম ভাঙলো। বুয়া জানালা খুলে দিয়েছে। বাইরে সব কিছু সাদা কয়াশায় ঢাকা। মশারি তুলতে তুলতে বুয়া বললো, তুমি খোয়াব দেখতাছিলা।

তুমি জানলে কীভাবে? হাই তুলে জিজ্ঞেস করলো তানিয়া।

কী জানি ওয়াক ওয়াক কইরা ইংরেজি কইতাছিলা। বুয়া হাসতে হাসতে বললো, ল্যাখাপড়া শিখলে ইংরেজি খোয়াব দেখন যায়।

আমি কী দেখেছি জানো? তুমি গার্লস স্কুলে ঘন্টা বাজাচ্ছো।

তোবা তোবা! আমি ক্যান ব্যাডাগো সামনে ঘন্টা বাজামু? মাইনষে কইবো কী!

মেয়েদের স্কুল। আমাদের বাড়ির সামনে হয়েছে। তোমাকে সবাই দপ্তরি আপা বলছিলো।

লাজুক হেসে বুয়া বললো, হইলে তো ভালই হয়। এবার ওঠো। তোমার গরম পানি ঠাণ্ডা ওইয়া যাইতাছে।

বুয়া উঠেছে অন্ধকার থাকতেই, যখন মোরগরা প্রথম ডেকেছে। ওদের ঘর থেকে একটু দূরে রান্নাঘর। লাইলির মা ওদের বাড়িতে নাশতা খেতে বললেও বুয়া জানে তানিয়া শীতকালে গরম পানি না হলে মুখ

ধুতে চায় না। বাপ আর মেয়ে দুজনেরই ঘুম থেকে উঠে নাশতা করার আগে এক কাপ চা চাই। অন্যের বাড়িতে এসব আবদার না করে নিজেরা করা ভালো, এই ভেবে ভোর না হতে বুয়া রান্নাঘরে ঢুকেছে।

তানিয়ার বাবার সব দিকে খেয়াল থাকে। মাটির চুলোটা পরিষ্কার করিয়ে রেখেছেন। এক পাশে শুকনো লাকড়ি। শুধু হাড়ি পাতিলের কাঠের বাক্সটা খোলা হয়নি। ওটার চাবি বুয়ার আঁচলে বাধা। ঢাকার বাড়ির রান্নাঘরের মিটসেফটাও জায়গা মতো রাখা। তানিয়ার মা মারা যাওয়ার আগের বছর ভারি শখ করে বানিয়েছিলেন মিটসেফটা। কথাটা মনে পড়তেই বুয়ার বুকটা টন টন করে উঠেছিলো। এরকম সাজানো সংসার ফেলে অসময়ে চলে গেলো। বুয়াকেও কী কম যত্নে রেখেছিলেন! কখনও বুঝতে দেননি ও যে বাড়ির চাকর। নিজের পরনের শাড়ি ওকে পরতে দিতেন। দুই ঈদে ভালো শাড়ি কিনে দিতেন। গায়ের চাদর, সুয়েটার, স্যাণ্ডেল দুই জোড়া–কী দেননি বুয়াকে! একা রান্নাঘর গোছাতে গোছাতে এসব কথা ভাবছিলো বুয়া।

তানিয়ার গরম পানি করতে করতে আকাশ ফর্শা হয়ে গেলো। বাপ বেটি দুজনেরই সকালে ওঠার অভ্যাস। তানিয়া স্কুলে যাওয়ার আগে এক ঘন্টা পড়ার টেবিলে কাটায়। বাবা বলেন, ভোরবেলার পড়া বেশি মনে থাকে। তানিয়া নিজেও জানে কথাটা মিথ্যে নয়। মনে রাখার জন্য রাতে যা তিন চার বার পড়তে হয় ভোরে একবার পড়লেই চলে।

গ্রামের বাড়িতে প্রথম সকালে তানিয়া অবশ্য পড়তে বসেনি। মুখ ধুয়ে গায়ে উলের গরম চাদর জড়িয়ে সামনের বারান্দায় এসে বসেছে। বাবা বেতের সোফা বিক্রি করে দিয়ে শুধু ডাইনিং টেবিলের গোটা চারেক কাঠের চেয়ার আর ড্রইং রুমের তিনটা বেতের চেয়ার রেখেছেন। দুটো স্টিলের আলমারি ছিলো, একটা বিক্রি করে দিয়েছেন। জিনিষপত্র বিক্রি করে বাবা পনের হাজার টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকায় তানিয়ার স্কুলের পোষাক, খাতাপত্র কিনতে হয়েছে। জয়াদি ওর টিউশন আর বোর্ডিং ফি মাপ করে দিয়েছিলেন। তারপরও অন্য সব জিনিষপত্র কিনতে তিন হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছে।

কাল শনিবার তানিয়া নতুন স্কুলে যাবে। শুনেছে ভীষণ কড়াকড়ি নাকি সেখানে। ওদের ক্লাসের আরতির বড় বোন পড়তো ভারতেশ্বরী হোমস-এ। তানিয়া সেই স্কুলে ভর্তি হবে শুনে আরতি ওকে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছে। শুনে তানিয়ার মনে ভয় আর আনন্দের একটা মিশ্র অনুভূতি হয়েছে।

উঠোনে এক পাল বাচ্চা নিয়ে দুটো মুরগি চরে বেড়াচ্ছিলো। বাচ্চারা ঘাসের ভেতর খাবার খুঁজছে। মায়েরা একটা কিছু পেলে কঁক কঁক করে বাচ্চাদের ডাকছে। আর বাচ্চারা কিচ কিচ করে ছুটে গিয়ে মাকে ঘিরে ধরছে। তানিয়া ভাবলো রোজার বন্ধে বাড়ি এলে হাঁস আর মুরগি পুষবে।

মা পুষতেন কুকুর। কালো সরাইলের কুকুর ছিলো ওদের। মা মারা যাওয়ার সাত দিন পর কুকুরটা মরে গিয়েছিলো। এতে অবশ্য বুয়া খুশি হয়েছিলো। কুকুর একেবারে পছন্দ করে না বুয়া। বলে, কুত্তা হইলো নাপাক জিনিষ। গায়ে লাগলে ওজু নষ্ট হয়। আমগো নবীজি পুষতেন বিলাই । ইন্দুরেরও ডর নাই, পুষলে সুন্নতও হয়।

বাবা বললেন, গ্রামের বাড়ি কেমন লাগছে তানিয়া?

হঠাৎ বাবার গলা শুনে চমকে উঠলো। বাবা কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি। বললো, ভালো লাগছে বাবা। তুমি যে ফার্মের কথা ভাবছো সেখানে হাঁস মুরগি থাকবে?

আমি মাছের খামারের কথা ভাবছিলাম। তুই যদি চাস হাঁস মুরগিও থাকতে পারে।

বাবাকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুয়া ওর ঘর থেকে বেতের চেয়ার বের করে দিলো। বললো, খালু চা দেই?

বাবা মৃদু হেসে বললেন, দিতে চাইলে দাও। শহরের সব অভ্যাস কী গেরামে রাখতে পারুম!

এইটা কি কন খালু? আমি কি মরছি?

বুয়া চা বানাতে রান্নাঘরে ঢুকলো। তানিয়া ভাবছিলো কাল রাতের কথা বাবাকে বলবে কিনা। বুয়ার অবশ্য ধারণা ওটা তানিয়ার চোখের ভুল। একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললো, বাবা জানো কাল রাতে আমি অদ্ভুত এক জিনিষ দেখেছি।

বলিস কী? বাবা অবাক হলেন–কখন, কোথায় দেখলি?

রাত তখন বারোটার মতো হবে। আমার ঘুম আসছিলো না। জানালার দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখি দুটো কালো ছায়ার মতো, জানালার কাছে নড়াচড়া করছিলো। বুয়ার গলা শুনে হাওয়া হয়ে গেলো।

বাবা হেসে বললেন, গ্রামের বাড়িতে এসেই রহস্য আর এ্যাডভেঞ্চার খোঁজা শুরু করেছিস?

রহস্য বলছো কেন বাবা? চোর-টোরতো হতে পারে!

গ্রামে চোররা খোঁজ খবর নিয়ে আসে। জানে আমার বাড়িতে এক রত্তি সোনা কিংবা নগদ হাজার খানেক টাকাও পাবে না। এ বাড়িতে কখনও চোর আসবে না।

বাবার কথা শুনে তানিয়া দমে গেলো। চোর যদি না হয় তাহলে তো খুবই ভয়ের কথা। ঢাকা থাকতে বুয়া প্রায়ই গ্রামের এই বাড়ি নিয়ে দুঃখ করতো। গিরস্তের বাড়ি, বেশি দিন খালি রাখতে নাই। খালু বছরে একবার যায় দুই তিন দিনের লাইগা। সারা বছর খালি থাকে। এইডা ভালা কথা না। খবিস জ্বীনেরা এই রকম বাড়ির তালাশে থাকে।

চা খাওয়া শেষ হতেই লাইলি আর রাজন এলো তানিয়াদের ডাকতে। দুজনে দুটো মোটা খদ্দরের চাদর গায়ে জড়িয়ে শীতে কাঁপছিলো। বাবা বললেন, লাইলি রাজন ভেতরে এসে বস। তোমাদের গরম কাপড় নেই?

রাজন লজ্জায় আধখানা হয়ে গেলো। লাইলি বললো, আমাগো গরম সুয়েটার ইশকুলে যাওনের সময় পরি।

তানিয়া ওর বাবার কানে কানে বললো, আমার দুটো সুয়েটার ছোট হয়ে গেছে। ওদের দেবো?

বাবা হেসে বললেন, ওদের জিজ্ঞেস কর।

তানিয়া ওদের জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করলো না। ঘরে গিয়ে ওর সুটকেস থেকে সুয়েটার দুটো বের করলো। একটা ক্লাস ফোরে থাকতে মা বুনে দিয়েছিলেন। আরেকটা একটু বড়, দোকান থেকে কেনা। ক্লাস সেভেনে থাকতেই ও হঠাৎ লম্বা হয়ে যাওয়াতে এক সঙ্গে অনেকগুলো জামা কাপড় ছোট হয়ে গেছে। কিছু অবশ্য বুয়া নিয়েছে তার নাতি নাতনিদের জন্য।

তানিয়ার সুয়েটার দুটোর বড়টা মেরুন রঙের, ছোটটা সবুজের ভেতর হলুদ ফুল তোলা, মোটেই পুরোনো মনে হয় না। রাজন আর লাইলি সুয়েটার পেয়ে দারুণ খুশি। তানিয়া বললো, এখনই পরে ফেল।

লাইলি রাজনের এত সুন্দর সুয়েটার ঘরে পরতে ইচ্ছে করছিলো না। ওরা স্কুলে যাওয়ার সময় যে সুয়েটার পরে সেগুলোর চেয়ে এগুলো অনেক সুন্দর। তবু তানিয়ার মন রাখার জন্য ওরা সুয়েটার পরলো। শীতে কুঁকড়ে যাওয়া ওদের জবুথবু চেহারা ঝলমল করে উঠলো।

বুয়া যে লাইলি রাজনকে সুয়েটার দেয়া পছন্দ করেনি এটা ওর চেহারা দেখেই তানিয়া বুঝে ফেলেছিলো। তবে বাবার ভয়ে বুয়া এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করলো না। রাগ দেখিয়ে বুয়া ওদের সঙ্গে নাশতা করতে যায়নি। বলেছে হাতের কাজ সেরে পরে যাবে।

তানিয়াদের চাচী খেতে দিয়েছিলেন রসে ডোবানো চিতই পিঠা। এত মজার পিঠা তানিয়া কখনও খায়নি। মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিঠার টুকরো মাখনের মতো গলে যাচ্ছিলো। তানিয়ার প্রশংসা শুনে চাচী ওর প্লেট পিঠা আর রসে ভরে দিলেন।

চাচা ভোর না হতেই বেরিয়েছেন। তানিয়া বলাতে লাইলি রাজন দুজনই ওদের সঙ্গে খেতে বসেছে। খেতে খেতে তানিয়া হালকা গলায় বললো, জানো লাইলি কাল রাতে না চোর এসেছিলো।

কখন আইছে? কী চুরি করছে?

চুরি করতে পারেনি। বলে তানিয়া রাতে ছায়ামূর্তি দেখার ঘটনাটা খুলে বললো। শুনে লাইলি রাজনের কপালে চোখ উঠলো।

তানিয়ার কথা শুনে বাবা মৃদু হেসে বললেন, তানিয়া, কেন বেচারাদের ভয় দেখাচ্ছিস। বললাম না আমাদের বাড়িতে চোর আসতে পারে না!

ওরা যদি চোর না হয় তাহলে তো আরও ভয়ের কথা বাবা! বুয়া বলছিলো আমাদের বাড়িতে খবিস জ্বীন থাকতে পারে।

এটা ভালো বলেছিস। বাবা শব্দ করে হাসলেন, যদি এটা দশ কান হয় জীবনেও বাড়িতে চোর ডাকাত আসবে না।

চাচী শুকনো গলায় বললেন, ভাইজান, জ্বীন ভূত নিয়া ঠাট্টা করন ভালা না। আপনের ঘরে সোমথ মেয়্যা। কখন কী হয় কিছুই কওন যায় না।

চাচীর কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন বাবা–আপনি তো জানেন না, আমরা হইলাম পীরের বংশ। আমার পরদাদা দুইটা জ্বীন পালতেন।

বাবাকে এসব ব্যাপারে কিছু বলা যে অর্থহীন এটা বুঝতে চাচীর দেরি হলো না। কথা না বাড়িয়ে লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন।

লাইলিদের বাড়িতে নাশতা সেরে বাবা তানিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন পুকুর দেখাতে। বাবার ভাগে মস্ত বড় পুকুর পড়েছে। পুকুর ভর্তি মাছ, সারাক্ষণ ঘাই মারছে। বাবা বললেন, আজ আমরা পুকুরের তাজা মাছ খাবো।

কে ধরবে তুমি? কথাটা শুনে তানিয়া আনন্দে উত্তেজিত হলো।

আমি কি মাছ ধরতে পারি না ভেবেছিস? আফটার অল আমি তো গাঁয়েরই ছেলে। এ পুকুরে ছেলেবেলায় কম মাছ ধরেছি!

কী দিয়ে ধরবে?

কেন, জাল দিয়ে রান্নাঘরে জাল দেখিসনি?

গত রাতে বুয়া হারিকেন হাতে তানিয়াকে সবগুলো ঘর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। অন্ধকারে রান্নাঘরে রাখা জাল ওর চোখে পড়েনি।

চলো না বাবা, এখনই ধরবে। আমি দেখবো।

চল। বলে বাড়ির উঠোনে পা রেখে বাবা থমকে দাঁড়ালেন।

তানিয়া বাবার পেছন পেছন আসছিলো। সামনে তাকিয়ে দেখে বারান্দায় বেতের চেয়ারে ধুতি পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সী এক সুদর্শন ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর পাশে অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী। দেখে মনে হয় কলেজে পড়ে। পরনে চওড়া নকশা পাড়ের টিয়া রঙের টাঙ্গাইল শাড়ি। গায়ে লাল আলোয়ান জড়ানো।

বাবা উচ্ছ্বসিত গলায়–আরে, বিভূতি যে! কখন এলে? বলে এগিয়ে গেলেন।

তানিয়া বুঝলো ইনিই বাবার স্কুল জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বিভূতিরঞ্জন। বাবার কাছে এঁর অনেক গল্প শুনেছে। ওঁর বাবা ঠাকুর্দারা জমিদার ছিলেন। এখন অবশ্য আগের অবস্থা নেই, তবু যা আছে আরও দুতিন পুরুষ বসে খেতে পারবে। শখ করে গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করেন, তবে বেতন নেন না। পরির মতো সুন্দর মেয়েটির কথাও তানিয়া শুনেছে। ওর নাম প্রতিমা। ওর ছোট বোনের নাম প্রতিভা।

বাবা এগিয়ে গিয়ে বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হুট করে কলকাতা চলে গেলে, ফিরলে কবে?

কাল সন্ধ্যায়। তোমার চাকরি নেই জেনে একটুও খারাপ লাগেনি, যখন শুনেছি তুমি এখন থেকে গ্রামে থাকবে। এরপর তার চোখ পড়লো তানিয়ার ওপর–বাহ, মেয়ে কত বড় হয়েছে। ঠিক মার মতো দেখতে।

তানিয়াকে কেউ যদি মার মতো বলে ওর খুব ভালো লাগে। মা ছিলেন অসাধারণ রূপসী।

প্রতিমা এগিয়ে এসে তানিয়ার হাত ধরে বললো, এই মিষ্টি মেয়েটির নাম তানিয়া না? কোন ক্লাসে পড়ো।

ক্লাস এইটে। তানিয়া মৃদু হেসে বললো, আপনি তো প্রতিমা—প্রতিমাদি।

ঠিক ধরেছো। তোমার কথা বাবার কাছে শুনেছি। তুমি জন্মেছো হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। আমরা তোমাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। এত্তটুকুন ছিলে।

আপনিও তখন ভালো করে কথা বলতে শেখেননি। তানিয়া মনে মনে হিসেব করেছে, খুব বেশি হলে প্রতিমা ওর চার পাঁচ বছরের বড় হবে।

বিভূতি কাকা বললেন, মেয়েকে শুনলাম ভারতেশ্বরী হোমস-এ ভর্তি করেছো? প্রতিভাও এখন ভারতেশ্বরীতে পড়ে।

প্রতিভা এবার কোন ক্লাসে?

ক্লাস নাইনে উঠেছে। তানিয়াকে কোন ক্লাসে দিয়েছো?

এইটে। প্রতিভা যখন ভারতেশ্বরীতে তানিয়ার আর ভাবনা কী। আমি চিন্তিত ছিলাম, মেয়ে কখনও একা আমাদের ছেড়ে কোথাও থাকেনি।

তুমি এ নিয়ে ভেবো না। তানিয়া কবে থেকে স্কুলে যাবে?

ভাবছি কালই নিয়ে যাবো।

ঠিক আছে। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। প্রতিভার সঙ্গে তানিয়ার আলাপ করিয়ে দেবো। জয়াদির সঙ্গে কথা বলেছিলে?

তিনিই তো সব করে দিলেন। বিভূতি, তোমাদের চা দিতে বলি?

বলতে পারো। গিন্নি বলে দিয়েছেন দুপুরে তোমরা আমাদের বাড়িতে খাবে।

দুই বন্ধুর কথার মাঝখানে প্রতিমাকে নিয়ে তানিয়া ওর ঘরে গেছে। বাবা তানিয়াকে ডেকে বললেন, বুয়াকে বল আমাদের সবাইকে চা দিতে।

তানিয়া রান্নাঘরে গিয়ে দেখে বুয়া মাদুর পেতে এক লোককে রুটি আর ডিম ভাজি খেতে দিয়েছে। তানিয়াকে দেখে লোকটা জড় সড় হয়ে গেলো। বুয়া একগাল হেসে বললো, আমার পোলা, কালা। ও আইসা পড়ছে দেইখ্যা আর ওই বাড়িতে যাই নাই।

তানিয়া হেসে বললো, ছেলে একা কেন, তোমার নাতি নাতনিরা কোথায়?

হ্যারা বিকালে আসবো। খালুর কাছে দেখলাম মেহমান আসছে, চা দিমু?

চায়ের কথাইতো বলতে এলাম। কৌটোয় চানাচুর আছে না? খানিকটা দিও।

বুয়ার ছেলে বললো, মেহমান কারে কইতাছ মা? আমগো জমিদার বাবু তো!

বুয়া ব্যস্ত হয়ে বললো, হায় হায়, আগে কবি না? বয়স ওইছে, চোখে ভাল ঠাহর করি না। এতক্ষণ চা না দিয়া জমিদার বাবুরে বসায়া রাখলাম। বাবুর লগে হ্যাঁর মেয়াও তো আইছে। দুইটা ডিম ভাইজা দিমু?

দিতে পারো। বলে তানিয়া রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওর সামনে বুয়ার ছেলে লজ্জায় খেতে পারছিলো না। ঘরে এসে বাবাকে বললো, জানো বাবা, বুয়ার ছেলে এসেছে ওকে দেখতে।

বাবা মৃদু হেসে বললেন, ভালোই হয়েছে। মাছ ধরতে কালাকে লাগবে।

তুমি এখন মাছ ধরবে? তানিয়া বুঝতে পারছিলো না বিভূতি কাকাদের রেখে মাছ ধরতে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না।

বিভূতি আমাদের দুপুরে ওদের বাড়িতে খেতে বলেছে। আমি বলেছি এক শর্তে। মাছ হবে আমার পুকুরের।

প্রতিমা বললো, শুধু দুপুরে নয় নূরু কাকু। রাতেও আমাদের ওখানে খাবেন সারাদিন আমাদের বাড়িতে থাকবেন।

বিভূতি কাকা হেসে বললেন, অনেক কথা জমে আছে নূরউদ্দিন। একদিনে কুলোবে না।

বাবাও হাসলেন–বাকি জীবন তো গ্রামেই কাটাবো বিভূতি। কত কথা বলতে পারো দেখবো।

তানিয়া লক্ষ্য করেছে বাবা যখন থেকে গ্রামে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন থেকে তাঁর স্বভাবের রুক্ষতা হারিয়ে গেছে। চেহারার একটা কোমল ভাব এসেছে, যেমন ছিলো মা বেঁচে থাকতে।

বুয়া বড় ট্রেতে করে চার জনের জন্য ডিমের অমলেট, বিস্কুট আর চানাচুর এনে বারান্দার বেতের টেবিলে রাখলো। বিভূতি কাকা বললেন, এত কে খাবে!

বুয়ার মাথায় লম্বা ঘোমটা টানা। বললো, আপনেগো খাতির করতে পারি সেই ক্ষমতা কি আমাগো আছে?

বাবা বললেন, তোমার কালাকে পাঠিয়ে দাও। আজ যদি ও কাজে না যায় এ বাড়িতে কাজ করুক।

আমাগো কাম থাকলে বাইরে যাওনের দরকার কী? বলে বুয়া চা আনতে গেলো।

একটু পরেই কালা এসে দাঁড়ালো বারান্দার নিচে। নিচু গলায় বললো, নানায় ডাকছেন?

ডাকছি আগে মাছ ধরনের লাইগা। দেখছ তো জমিদার বাবু আইছেন। আট দশ সেরি একটা ধরতে পারবা না? নাকি আমারও নামন লাগবো?

আমিই পারুম। আর কী করতে ওইবো?

বাড়ির পিছে জংলা সাফ করবা। পিছনের জমিতে পেঁপে আর কাগজি লেবুর বাগান করুম।

রান্নাঘর থেকে জাল কাঁধে নিয়ে কালা পুকুরে গেলো। প্রতিমা বললো, বাবা, তানিয়াকে নিয়ে মাছ ধরা দেখতে যাবো?

বিভূতি কাকা কিছু বলার আগে বাবা বললেন, যাও মা। এটা তো তোমাদের নিজেদের বাড়ি।

তানিয়াকে নিয়ে প্রতিমা পুকুরের দিকে যাওয়ার পর বিভূতি কাকা মুখ টিপে হেসে বললেন, মনে হলো একটু খোঁটা দিলে নূরউদ্দিন!

খোঁটা দেবো কেন? বাবা মৃদু হাসলেন–তুমি আমার কাছে দশ হাজার টাকা পাও বিভূতি।

ওই দশ হাজার তুমি নিয়েছিলে পাঁচ বছর আগে পুকুর পরিষ্কার করার জন্য। ওই টাকার সঙ্গে আমি আরও লাখ খানেক ইনভেস্ট করতে চাই, যদি তোমার খামারের পার্টনার করে নাও আমাকে।

বাবা অভিভূত গলায় বললেন, সত্যি বলছো বিভূতি? আমি গত সাত দিন ধরে ব্যাংকে দৌড়োদৌড়ি করছি লোনের জন্য। এক লাখ টাকা লোনের জন্য দশ হাজার টাকা ঘুষ চায়। ভাবতে পারো কী মগের মুলুকে বাস করি!

আমি থাকতে তুমি ব্যাংকে দৌড়োবে কেন? দরকার হলে দু তিন লাখও ইনভেস্ট করতে পারবো। তুমি গ্রামে থাকবে, এটা যে আমাদের জন্য কত বড় ভরসার কথা তুমি নিজেও জানো না।

কিছু কথা আমার কানে এসেছে। ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঘন্টা খানেক পর ছয় সাত সেরি দুটো রুই মাছ হাতে ঝুলিয়ে কালা এসে দাঁড়ালো বারান্দার নিচে। বললো, আগের রাইতে যদি চার ফালাইতাম দশ সেরি মাছ দশটা ধরতে পারতাম। বড় মাছ বহুৎ সেয়ানা।

বাবা বললেন, এই দুইটা জমিদার বাড়িতে দিয়া আয়।

বিভূতি কাকা আঁতকে উঠলেন–তুমি ক্ষেপেছো নূরউদ্দিন! আমাদের বাড়িতে খাওয়ার লোক কোথায়? একটা তুমি রাখো। কালা, একটা তোমার মাকে দিয়ে এসো।

জমিদার বাবুর কথার ওপর আর কারও কথা চলে না। কালা একটা মাছ রান্নাঘরে রেখে আরেকটা নিয়ে জমিদার বাড়ি রওনা দিলো।

ততক্ষণে তানিয়া আর প্রতিমাও এসে গেছে। প্রতিমা বললো, নূরু কাকু, চলুন। আমাদের বাড়িতে বসে গল্প করবেন। জানো বাবা, কাল রাতে তানিয়া ভূত দেখেছে।

বিভূতি কাকা শুকনো গলায় বললেন, আমরা এত বছর ধরে দেখছি, নুরউদ্দিনরা একবার দেখেছে–এ আর এমন কী।

০৫-৬. প্রতিমাদের আরেক জগৎ

৫. প্রতিমাদের আরেক জগৎ

রত্নেশ্বরী গ্রামে পাকা দালান বলতে একটাই, সেটা হলো প্রতিমাদের। লোকে রায় বাড়ি বলে, পুরোনোরা বলে জমিদার বাড়ি। পুরোনো আমলের বনেদি চেহারার দোতালা বাড়ি, তবে আগেকার সেই জৌলুস আর নেই। বহু কাল বাইরে রং দেয়া হয়নি, কোথাও দেয়ালের আস্তর খসে লাল ইট

বেরিয়ে গেছে, ফাঁকে ফাঁকে বট গাছের নধর চারাও উঁকি দিচ্ছে। দূর থেকে দেখলে গা ছম ছম করে। এ বাড়িতেই থাকে প্রতিমা, ওর বাবা, মা আর ছোট বোন প্রতিভা যখন ছুটি কাটাতে আসে।

তানিয়া লক্ষ্য করেছে বাড়ির বাইরে যতটা জীর্ণদশা, ভেতরটা তেমন নয়। সাদা চুনকাম করা দেয়াল, শ্বেত পাথরের মেঝে, বসার ঘরে ঝাড়বাতি, দামী মেহগনি কাঠের নকশা তোলা আসবাবপত্র, সব কিছুতেই জমিদারি ছাপ লেগে আছে।

দুপুরে খাওয়ার পর প্রতিমার ঘরে এক মানুষ সমান উঁচু বিশাল মেহগনি কাঠের পালঙ্কে শুয়ে ওরা দুজন কথা বলছিলো। পালঙ্কের গায়ে আঙুর লতার নকশার গায়ে হাত বুলিয়ে তানিয়া বললো, জীবনে প্রথম এ দামী খাট চোখে দেখলাম। অনেক বড় জমিদার ছিলে তোমরা?

প্রতিমার কাছে এ ধরনের কথা শুনতে মোটেই ভালো লাগে না। তানিয়াকে বললো, সকাল থেকে তুই অনেক বার এ কথা বলেছিস। জমিদারদের সম্পর্কে তুই ভাবিস কী বলতো? এই যে দালান কোঠার বাহার দেখছিস প্রত্যেকটা ইটের গায়ে গরিব প্রজাদের ঘাম আর রক্ত মাখা। যে জমিদার যত অত্যাচারী আর যত পাজী ছিলো তাদের বাড়িঘরের বাহারও তত বেশি। ঠাকুরদার কাছে শুনেছি আমাদের পূর্ব পুরুষরা ভীষণ অত্যাচারী ছিলেন। ঠাকুর্দার যিনি ঠাকুর্দা ছিলেন তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা তাকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। তার এক ভাই মরেছে অপঘাতে। বংশী নদীর তীরে আমাদের পুরোনো পোড়ো বাড়িটা এখনও আছে। এ বাড়ি বানিয়েছেন ঠাকুরদার বাবা। এসব জমিদারি নিয়ে বড়াই করার কিছু নেই তানিয়া, বরং জমিদারের বংশধর হওয়াটা লজ্জার কথা। এই লজ্জা ঢাকার জন্যেই বাবা স্কুলে মাস্টারি করেন।

প্রতিমার কথা শুনে তানিয়ার খুব ভালো লাগলো। বললো, সব বড়লোকের ছেলেমেয়েরা যদি তোমার মতো ভাবতে পারতো, তাহলে তো কথাই ছিলো না। আনন্দময়ী স্কুলে আমাদের ক্লাসে পড়তো শায়লা পারভীন। জমিদারের বংশ বলে অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না।

কয়েক ঘন্টার আলাপে তানিয়া আর প্রতিমা আপনি তুমি বলা থেকে তুমি আর তুই-এ নেমে এসেছে। বনেদি জমিদারের রূপসী নিরহংকারী মেয়েটিকে তানিয়ার যেমন ভালো লেগেছে, তেমনি প্রতিমারও ভালো লেগেছে স্কুল মাস্টারের মা হারা সরল ও আত্মমর্যাদা সচেতন মেয়েটিকে।

প্রতিমা বললো, তোর কি ঘুম পাচ্ছে তানিয়া?

মোটেও না। দিনে আমি কখনও ঘুমোই না। তুমি কি ঘুমোব?

না রে! তোর সঙ্গে গল্প করতে ভালোই লাগছে। সারা গ্রামে কথা বলার কেউ নেই। মাসে দু মাসে দেলদুয়ারের মাসিরা বেড়াতে এলে যা একটু সময় কাটে।

তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত তবু ইলেকট্রিক লাইন এসেছে। টেলিভিশনটা অন্তত দেখতে পারো। আমাদের বাড়িতে যে কবে ইলেকট্রিসিটি যাবে কে জানে!

চেয়ারম্যান চেষ্টা করছে নিজের বাড়িতে নিতে। তখন আপনা থেকেই তোরা লাইন পেয়ে যাবি।

ইলেকট্রিকের আলো না থাকলে অন্ধকার যে এত ঘন আর কালো হতে পারে ভাবতেই পারতাম না।

শহরে যখন ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তখন অন্ধকার কি সাদা আর পাতলা থাকে?

প্রতিমার কথা বলার ধরন দেখে তানিয়া হেসে ফেললো–হ্যাঁগো প্রতিমাদি, শহরের অন্ধকার কখনও এত ঘন হয় না। শহরের ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও রাস্তায় গাড়ি চলে। গাড়ির আলো আছে, প্রায় বাড়িতে চার্জার আছে। অন্ধকার জমাট বাঁধার সুযোগ পায় না।

ভালো বলেছিস তো তানিয়া। আমি কখনও তোর মতো ভাবিনি। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পড়েছিস?

হ্যাঁ পড়েছি। কেন বলতো?

টেনের বইতে শ্রীকান্তের একটা অংশ পড়ায়। এসএসসিতে প্রশ্ন আসে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত অবলম্বনে আঁধারের রূপ বর্ণনা কর। মনে হয় তুই ভালোই লিখতে পারবি।

কাল রাতে বিছানায় শুয়ে শহর আর গ্রামের অন্ধকারের পার্থক্য নিয়ে ভেবেছিলো তানিয়া। হঠাৎ মনে পড়াতে বললো, কাল রাত্রে আমার কালো ছায়ামূর্তি দেখার কথা শুনে কাকাবাবু সকালে এমন কথা কেন বললেন প্রতিমাদি?

কোন কথা?

তোমরা নাকি সারা বছর এসব দেখো?

গ্রামে এসব দেখা অস্বাভাবিক নয়। ঘরে ঘরে এমন কথা শোনা যায়।

কী দেখা যায় খুলেই বলো না!

তানিয়াকে সব কথা বলা যায় কিনা কিছুক্ষণ ভাবলো প্রতিমা। কথা শুনে মনে হয় তানিয়া খুবই বুদ্ধিমতি মেয়ে, সাহসীও বটে। ওর বয়সী কোনও মেয়ে পথের পাঁচালী আর অপরাজিত পড়ে মুগ্ধ হয়েছে–এরকম কদাচিৎ দেখা যায়। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিমা বললো, শোন তাহলে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে খুব অত্যাচারী জমিদার ছিলেন তোকে তো বলেছি। ইংরেজদের দালালী করে সেই আমলে ওঁরা বিস্তর টাকা জমিয়েছিলেন। আমাদের আগের বাড়িতে কয়েদখানা ছিলো, গুমঘর

ছিলো। ঠাকুরদার কাছে শুনেছি প্রজারা খাজনা দিতে না পারলে কয়েদখানায় আটক করে চাবকানো হতো। কাটা জায়গায় নুন ছিটিয়ে মজা দেখতো। শাস্তির মাত্রা বেশি হলে, যদি কেউ জমিদারের হুকুম অমান্য করতো তাকে গুম ঘরে ফেলে দিতো। গুমঘরের কোন জানালা ছিলো না। একটাই দরজা ছিলো ছাদের কাছে। সেই দরজার কাছে কেউ পৌঁছতে পারতো না। পারলেই বা কী! লোহা দিয়ে বানানো ছিলো সেই দরজা। বেচারা প্রজারা, বেশির ভাগ ভয়ে হার্টফেল করে মরতো, নাহলে মরতো না খেয়ে। লাশ সেখানেই পড়ে থাকতো। দরজা খুললে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ বেরুততা। নিচে দেখা যেতো কঙ্কাল আর কঙ্কাল, এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। কে যেন দেখেছে গুমঘরে অনেক ইঁদুর ছিলো, একেকটা বেড়ালের মতো বড়।

প্রতিমার কথা শুনতে শুনতে তানিয়া যে কখন শোয়া থেকে উঠে বসেছে নিজেও টের পায়নি। একটু থেমে প্রতিমা বললো, তোরা বিশ্বাস করিস কিনা জানি না। মারা যাওয়ার পর মানুষের যদি সকার না হয় তাহলে তাদের আত্মা মুক্তি পায় না। আমরা যেমন কাশীতে গিয়ে আত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করি–তবেই আত্মা মুক্তি পায়। নইলে এসব আত্মা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। মুক্তির জন্য সারাক্ষণ ছটফট করে। জীবিত মানুষের ওপর ওদের ভীষণ রাগ। গুমঘরে যারা মরেছে তাদের কারোই সদগতি হয়নি। আমাদের পুরোনো মহলের চারপাশে বহু কাল ধরে এসব আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুরদার এক ঠাকুরদা যে অপঘাতে মরেছেন তোকে বলেছি?

হ্যাঁ বলেছে। কী ধরনের অপঘাত?

সুস্থ সবল মানুষ সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছিলেন ঘোড়ায় চেপে। সারা রাত ফেরেননি। সকালে বংশী নদীর তীরে দেখা গেলো লাস পড়ে আছে ধলা কর্তার। অসম্ভব ফর্শা ছিলেন বলে সবাই তাকে ধলা কর্তা ডাকতো। খুবই অত্যাচারী ছিলেন। গ্রামের বউ ঝিরা তাঁর অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরুতে পারতো না। তার লাশের গায়ে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিলো না। চেহারাটা শুধু নীল হয়ে গিয়েছিলো। চোখ দেখে মনে হয়েছিলো মরার আগে ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। তার ঘোড়াটাও পাশে মরে পড়েছিলো। পুরোনো মহলের আশে পাশে হঠাৎ হঠাৎ কালো কালো ছায়ার মতো মানুষ ঘুরে বেড়াতে আমাদের অনেকেই দেখেছে। অল্প কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়। বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

তোমাদের এ বাড়িতে গুমঘর নেই?

না। বংশের দুজন পর পর অপঘাতে মারা যাওয়াতে ঠাকুরদার বাবা শুধু পুরোনো মহলই ছাড়েননি, প্রজাদের ওপর অত্যাচার করাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে অত্যাচার না করলে জমিদারিও রাখা যায় না। ঠাকুরদার আমলেও প্রজাদের ধরে এনে মারধোর করা হতো, জমিজমা কেড়ে নিয়ে পথের ভিখিরি বানিয়ে দিতো। এসব কথা ঠাকুরমার কাছে শুনেছি। ঠাকুরমা ছিলেন গরিব পণ্ডিত বংশের মেয়ে। এসব জমিদারি অনাচার দুচোখে দেখতে পারতেন না। তবে এ বাড়িতে মানুষ খুন করার ঘটনা যে কখনও ঘটেনি এমন কথাও বলা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বাড়িটা পাকিস্তানী সৈন্যদের ক্যাম্প ছিলো। বাবা তো চলে গেলেন নূরু কাকুদের সঙ্গে যুদ্ধে। ঠাকুরদা আর ঠাকুরমারা ছিলেন কলকাতায়। যুদ্ধের পর ফিরে এসে গ্রামের লোকদের কাছে শুনেছেন কাঁচারিবাড়ির সামনে অনেক মানুষকে মেরে এক সঙ্গে মাটিতে পুঁতে রেখেছে। ঠাকুরদা লোকজন লাগিয়ে খুঁড়ে অনেক লাশ পেয়েছিলেন। লাশের যা অবস্থা দেখে বোঝার উপায় ছিলো না কে হিন্দু আর কে মুসলমান। সব লাশ তুলে বংশী নদীর তীরে আলাদা করে কবর দেয়া হয়েছে। ওদের জন্য হিন্দু মতেও পিণ্ডদান করা হয়েছে।

বলতে গিয়ে প্রতিমার গলা ভারি হয়ে গেলো। তানিয়া কিছুক্ষণ পর বললো, তুমি যে বললে পাকিস্তানী সৈন্যরা যাদের মেরেছিলো তাদের তোমার ঠাকুরদা সত্ত্বার করেছিলেন। সংস্কার না করলে কি তাদের আত্মা মুক্তি পেতো না?

পেতো। দেশের জন্য যারা জীবন দেয় তাদের আত্মা মৃত্যুর পর পরই স্বর্গবাসী হয়। ঠাকুরদা সত্ত্বারের ব্যাপারে মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনিও নাকি ঠাকুরদাকে বলেছিলেন, তিনি চাইলে মসজিদে মিলাদ পড়াতে পারেন, তবে শহীদদের জন্য বেহেশতের সেরা জায়গা রাখা আছে। কবর দেয়ার পর ইমাম সাহেব সবার জন্য দোয়া করেছেন।

কথা বলতে বলতে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে ওরা টের পায়নি। বাড়ির পুরোনো ঝি মোক্ষদাদি এসে বললো, কর্তামা ডাকতাছে নিচে। চা দেওয়া ওইছে।

তানিয়াকে নিয়ে প্রতিমা নিচের খাবার ঘরে এসে দেখলো সবাই ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিভূতি কাকা তানিয়াকে বললেন, চেহারা দেখে তো মনে হয় এক ফোঁটা ঘুম হয়নি।

কাকিমা মৃদু হেসে বললেন, তোমরা বড়রা সারাক্ষণ গল্প করে কাটালে। ছোটরা কোন দুঃখে ঘুমোবে!

টেবিলে খাবারের বহর দেখে আঁতকে উঠলো তানিয়া। দুপুরে খাওয়ার সময় এগারো পদ রান্না নিয়ে অনেক রসিকতা হয়েছে। চার ঘন্টা না যেতেই লুচি, আলুর দম, সুজির মোহনভোগ আর সন্দেশ খেতে

হবে–এ কী রাক্ষুসে কারবার! তানিয়ার চেহারা দেখে কাকিমা নরম গলায় বললেন, তোমার যা ইচ্ছে করে তাই খাও। সন্দেশটা আমি নিজ হাতে বানিয়েছি।

তানিয়া করুণ গলায় বললো, আমি শুধু এক টুকরো সন্দেশ খাবো।

তাই খাও মা। বলে কাকিমা ওর প্লেটে দুটো সন্দেশ তুলে দিলেন।

তানিয়ার প্রথমে মনে হয়েছিলো একটার বেশি খেতে পারবে না। চামচে কেটে একটুখানি মুখে দিয়ে দেখলো এত ভালো সন্দেশ জীবনে খায়নি। কথাটা বলতে গিয়ে চেপে গেলো। দুপুরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে ভালো বললেই কাকিমা আরও দুটো সন্দেশ ওর প্লেটে তুলে দেবেন। খেতে খেতে মনে হলো আনন্দময়ী স্কুলে পড়ার সময় বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে ক্ষিদেয় চোখে কী অন্ধকার দেখতো!

চা খাওয়ার পর বিভূতি কাকা বললেন, নূরউদ্দিন, চলো নদীর ধারে একটু হাঁটি।

প্রতিমা বললো, আমরাও একটু ঘুরতে যাবো বাবা।

যেতে পারো। বিভূতি কাকা মৃদু হাসলেন, সঙ্গে বনমালীকে নিতে ভুলে যেও না।

আমি ভুললেও বনমালী ভুলবে না। এই বলে তানিয়ার হাত ধরে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো প্রতিমা।

বনমালী নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করলো। ওর হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। পেটানো শরীর। বছর তিনেকের ওপর রায়বাড়ির পাহারাদারের চাকরি নিয়েছে। খুবই বিশ্বস্ত আর সাহসী পেয়াদা।

তানিয়া এ বাড়িতে ঢুকেই লক্ষ্য করেছে বাইরে যে রকম জীর্ণ দশা বাড়ির ভেতরটা তেমন নয়। সবুজ ঘাসে ঢাকা আঙিনায় হাঁটতে হাঁটতে ও বললো, প্রতিমাদি, বাড়ির বাইরের চেহারাটা এরকম রেখেছো কেন? রঙ করলে রাজপ্রাসাদের মতো লাগবে।

কী হবে করে!

বাড়িটা মজবুত হবে। দেখতেও সুন্দর হবে।

আর সুন্দর! দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিমা বললো, দু বছর আগে ইণ্ডিয়ার বাবরি মসজিদ ভাঙার পর এখানে হিন্দুদের ওপর কী অত্যাচার হয়েছে কাগজে পড়িস নি?

শুনেছি। কিন্তু তোমাদের তো এ গ্রামের সবাই ভালো বলে জানে!

যাদের ওপর অত্যাচার করছে তারা কি খারাপ ছিলো? আমাদের বাড়িও লুট করতে এসেছিলো পাশের গায়ের লোকেরা। রত্নেশ্বরীর মন্দিরেও আগুন দিতে গিয়েছিলো। এ গাঁয়ের লোকজন বাধা দেয়াতে পারেনি। বাবা অবশ্য আগে থেকে পুলিশ এনে রেখেছিলেন বাড়িতে। নইলে মন্দির আর বাড়ির ইট

কাঠ সব খুলে নিয়ে যেতো। রত্নেশ্বরীর মন্দিরে বিগ্রহের অনেক অলঙ্কার আগেই চুরি হয়েছে। সেবারও গুণ্ডাদের লক্ষ্য ছিলো দেবীর গলার নবরতের হার।

অনেক দামী হার?

এখন লাখ চারেকের মতো দাম হবে।

সব সময় দেবীর গলায় থাকে?

না, বিশেষ বিশেষ দিনে ওটা লোহার সিন্দুক থেকে বের করা হয়। রাতে ছ জন লোক মন্দির পাহারা দেয়।

গ্রামের লোকরা যদি গুণ্ডাদের বাধা দেয় তাহলে তো এদের ভালো বলতে হবে।

ভালো বটে, তবে সবাই নয়। এ গাঁয়ের অনেকে পাশের গায়ে গেছে লুট করতে। পাশের গাঁয়ে দুটো মন্দির ছিলো। একটাও আস্ত নেই। দু তিন বছর পর পর যদি এরকম হামলা হয়, বাড়িঘর মেরামত করে লাভ কী বল?

তানিয়া গম্ভীর গলায় বললো, শুনেছি বাবরি মসজিদ ভাঙার পর ইণ্ডিয়াতে অনেক মুসলমানকে মেরেছে।

ম্লান হেসে প্রতিমা বললো, আমরা কি ইণ্ডিয়া গিয়ে সেখানকার মুসলমানদের মেরেছি? নাকি আমরা বাবরি মসজিদ ভেঙেছি? যারা ভেঙেছে তাদের কিছু করতে পারবে না, মিছেমিছি এখানকার অসহায় হিন্দুদের ওপর চোটপাট করবে।

এসব ধর্ম টর্ম না থাকলে মানুষ অনেক ভালো থাকতো প্রতিমাদি।

কিছুটা হয়তো থাকতো। তবে জমিদার প্রজা কিংবা কারখানার মালিক শ্রমিক নিশ্চয় থাকতো। সাদা চামড়ার মানুষ আর কালো মানুষদের বিরোধ থাকতো। আরও অনেক বিরোধ থাকতো। থাকতোই বা বলছি কেন? এসব তো এখনও আছে। একটু থেমে প্রতিমা বললো, মানুষ আসলে খুব নিষ্ঠুর প্রাণী। অন্য কোনও প্রাণী মানুষের মতো নিষ্ঠুর নয়।

প্রতিমা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলো, নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে ওর বাবা একই বিষয়ে নিয়ে তানিয়ার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। সব শুনে তানিয়ার বাবা বললেন, বিভূতি, তুমি হতাশ হচ্ছে কেন? বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন করেছি কটা জামাতী আর মৌলবাদী গুণ্ডার ভয়ে কুঁকড়ে থাকার জন্য? আমরা সবাই জোট বেঁধে দাঁড়ালে ওরা পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।

তুমি জানো না নূরউদ্দিন, ওরা কতটা নৃংশস! গত চার পাঁচ বছরে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কী পরিমাণ বেড়েছে শুনলে চমকে উঠবে। তোমাকে কি বলেছি সরকার আমাদের বাড়িটাকে অর্পিত সম্পত্তি বলে নিয়ে নিতে চাইছে?

অর্পিত সম্পত্তি মানে?

পাকিস্তান আমলে যেটাকে শত্রু সম্পত্তি বলা হতো এখন বলা হয় অর্পিত সম্পত্তি। কোন হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গেলে তার সম্পত্তির মালিক হবে সরকার।

তোমরা তো যাওনি। যাবেও না। তোমাদের বাড়ি কেন সরকার নিতে যাবে?

সরকারের কথা হচ্ছে চোষট্টির দাঙ্গার পর যে সব হিন্দু ইণ্ডিয়া চলে গেছে তাদের কিংবা আরও আগে যারা দেশ ছেড়েছে তাদের সম্পত্তির মালিক সরকার। আমাদের ছোটকা পাকিস্তান হওয়ার পাঁচ বছর পর তাঁর এ বাড়ির অংশ আমাদের কাছে বিক্রি করে চলে গেছেন। এটা সরকারী লোকদের বোঝানো যায় না। আজকাল এমন দাঁড়িয়েছে, কোনও বাড়ির মালিক হিন্দু হলেই সেটা অর্পিত সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে দিচ্ছে। এ নিয়ে যে কী হয়রানি হতে হচ্ছে ভাবতেও পারবে না। এ ছাড়া গুণ্ডা বদমাশদের হুমকি তো আছেই।

বহুদিন পর জানুয়ারির হিমেল বাতাসে কুয়াশা ঢাকা বংশী নদীর তীরে হাঁটতে ভালোই লাগছিলো তানিয়ার বাবার। ছোটবেলার অনেক কথা মনে পড়ছিলো। কতদিন স্কুল ছুটির পর বিভূতির সঙ্গে ওদের পুরোনো মহলে গিয়েছেন গুপ্তধন খোঁজার জন্য, সেসব কথা ভাবতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন ছোটবেলার দিনগুলোতে। ছোটবেলার প্রিয় বন্ধু বিভূতি, যার সঙ্গে একাত্তরের নয় মাস এক তাঁবুর নিচে শুয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন তার এমন বিপদ শুনে তানিয়ার বাবার বুকটা ব্যথায় ভরে গেলো। বন্ধুর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন, বিভূতি, এখন আর তুমি একা নও। আমি আছি তোমার পাশে। আশে পাশের দশ গাঁয়ের মুক্তিযোদ্ধারা একজোট হয়ে আবার লড়বো এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

জানি নূরউদ্দিন। আমার কোনও বিপদ হলে তুমি পাশে থাকবে। আজকাল শুধু গুণ্ডা বদমাশ নয়, অশরীরী আত্মারাও আমাদের পেছনে লেগেছে।

তুমি এসব বিশ্বাস কর বিভূতি?

না করে উপায় কী! ভালো করেই জানো আমাদের পূর্বপুরুষরা কী রকম অত্যাচারী ছিলো। গুমঘরে ফেলে যাদের মেরেছে তাদের অভিশাপ এখনও কাটেনি।

আমি বলছি বিভূতি, হয় তোমাদের চোখের ভুল, নয়তো কোনও খারাপ লোক তোমাদের ভয় দেখাবার জন্য এসব করছে।

তুমি তো গ্রামে থাকবে বলে এসেছে। নিজের চোখেই দেখো। কাল রাতে তানিয়া যে ওদের দেখেছে এ নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

খারাপ লোক ভয় দেখাবার জন্য করতে পারে।

তোমাকে কেন ভয় দেখাবে?

আমার ভাইটিকে ভালো করেই চেনো। ওরা চায় না আমি গ্রামে থাকি।

হ্যাঁ শুনেছি, ও নাকি এখন জামাত করে।

রত্নেশ্বরীর আকাশে অন্ধকারের কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে তানিয়ার বাবা বললেন, বিভূতি, চলো ফিরে যাই।

.

৬. নতুন স্কুল নতুন বন্ধু

ভাই পারু,

বলেছিলাম নতুন স্কুলের প্রথম দিনই তোকে চিঠি লিখবো। প্রথম দিন দূরে থাক কাল পর্যন্ত দম ফেলার সময় পাইনি। ভাবতে পারিস ঘুম থেকে উঠতে হয় সূর্য ওঠার আগে! সকাল বিকাল যে রকম ড্রিল করায় মনে হয় ক্যান্টনমেন্টের আর্মিদের হার মানাবে। প্রথম দিন ড্রিল করে মনে হয়েছিলো আরেক দিন এরকম করতে হলে নির্ঘাৎ মরে যাবো। এখনও মরিনি। মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে সয়ে যাবে।

স্কুলে কড়াকড়ির কথা আগে শুনেছিলাম বটে, এসে দেখি পান থেকে চুন খসার জো নেই। সব কাজ নিজেদের করতে হয়। এমন কি রান্নার কাজও পালা করে করতে হয়। সবচেয়ে খারাপ লাগে বারোয়ারি বাথরুম পরিষ্কার করতে । খারাপ লাগলেও উপায় নেই, সবাইকে করতে হয়। আনন্দময়ী স্কুল থেকে এসে আমি এই স্কুলের নাম রেখেছি নিরানন্দময়ী স্কুল। গত শনিবার বাবা আর বিভূতি কাকা আমাকে এখানে রেখে গেছেন। এত বড় নামী স্কুলে পড়বে ভেবে রীতিমতো রোমাঞ্চ হচ্ছিলো। শনিবার আমাদের হোস্টেলের মিসেস পেরেরা নিয়ম কানুন সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন। তখনও ভালোই লেগেছিলো, মনটা শুধু খুঁত খুঁত করছিলো রাত সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠতে হবে বলে। রোববার থেকে শুরু হয়েছে পরিপূর্ণ হোমস জীবন। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে রাতে বিছানায় শুয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো। আমাদের আনন্দময়ী স্কুলে আমি ইংরেজিতে কখনো আশির নিচে

নম্বর পাইনি। এখানকার ইংরেজির বহর থেকে মনে হচ্ছে পাশ করতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে। টিচারদের সঙ্গে ক্লাসে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। আমাদের আনন্দময়ী স্কুলের মতো টিচারদের আপা দিদি এসব বলা যাবে না। বলতে হবে মিস না হলে মিসেস। কী অস্বস্তি লাগে ষাট বছরের রাশভারি মহিলা অঙ্কের টিচারকে মিসেস সরকার ডাকতে। এখানে সবার আগে বন্ধুত্ব হয়েছে ক্লাস নাইনের প্রতিভার সঙ্গে। বাবার বন্ধু আমাদের গ্রামের বিভূতি কাকার ছোট মেয়ে প্রতিভা। এই নিরানন্দময়ী স্কুলে প্রতিভা আমার একমাত্র আশ্রয়। বিভূতি কাকারা এক কালে মস্ত জমিদার ছিলেন। গত শুক্রবার সারাদিন কাটিয়েছিলাম ওঁদের বাড়ি। কাকা কাকিমা ছাড়া বাড়িতে থাকেন বড় মেয়ে প্রতিমাদি। বিভূতি কাকার দুটো মেয়েই ডানা কাটা পরি। প্রতিমাদিকে প্রথম দেখে ভেবেছিলাম বুঝি কলেজে পড়েন। পরে শুনি গত বছর দিল্লী থেকে এম এ পাশ করে এসেছেন। জমিদারের বাড়ির মেয়ে হলে কী হবে, দুজনের ভেতর এক রত্তি অহংকার নেই। আমাদের শায়লা কথায় কথায় কেমন মনে করিয়ে দেয় ওর দাদা জমিদার ছিলেন। কেউ অন্যায় কিছু করলে বলে দেখতে হবে তো কোন বংশের মেয়ে। অথচ নিজে যে লাইব্রেরি থেকে বই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লো তা নিয়ে কোন লজ্জা নেই। প্রতিমাদি আর প্রতিভাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় বাবা কী করেন বলে স্কুলে শিক্ষকতা করেন। আসলেই তাই । প্রতিমাদি বলেছেন, জমিদারের ছেলে–এই অপবাদ ঘোচানোর জন্য বিভূতি কাকা গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করেন। ওদের দেখে মনে হয়েছে জমিদারদের বংশে ভালো লোকও জন্মাতে পারে। খাওয়ার সময় দেখেছি মুসলমান বলে ছোঁয়াছুয়ির কোন বালাই নেই। আরতিদের বাড়িতে ওর ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তোর মনে আছে কী হয়েছিলো। হিন্দু মেয়েদের এক টেবিলে আর মুসলমান মেয়েদের আলাদা টেবিলে খেতে দিয়েছিলো। হিন্দুদের ভেতর যারা উঁচু জাতের তারা বসেছিলো বাড়ির ভেতরে। বিভূতি কাকারাও ব্রাহ্মণ। ওদের ভেতর এ নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই। সেদিন খাবার টেবিলে বাবা ছোঁয়াছুয়ি নিয়ে কী একটা কথা বলাতে কাকিমা বলেছিলেন, আমাদের হিন্দু না ভেবে শুধু মানুষ ভাবুন না নূরুদা। তাহলে দেখবেন অনেক ঝামেলা মিটে যাবে। এ কথাটা আমারও মনে হয়, আমাদের ভেতর যদি ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ না থাকতো তাহলে অনেক ভালো হতো।

এতক্ষণ তো আমার কথা বললাম। এবার তোদের কথা বল। রাতে বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুলেই তোদর কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে তোর কথা। তোর মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আমি জানি আমাকে ওভাবে ফেয়ারওয়েল দেয়া, এত সব উপহার সবই তোর জন্য। শুয়ে শুয়ে ভাবি তুই আমার জন্য এত কিছু করেছিস, কিন্তু তোর জন্য কিছুই করতে পারিনি। আমি জানি একদিন আনন্দময়ী

স্কুলের সবাই আমার কথা ভুলে যাবে, শুধু তুই আমাকে মনে রাখবি। আমিও তোকে কোনদিন ভুলতে পারবো না.....

নতুন স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম ছুটির দিন দুপুরে তানিয়া ওর বিছানার পাশে পড়ার টেবিলে বসে পারুলকে চিঠি লিখছিলো। চিঠি লেখা তখনও শেষ হয়নি, ঘাড়ের ওপর গলা বাড়িয়ে প্রতিভা বললো, এত মনোযোগ দিয়ে যাকে চিঠি লিখছিস তানিয়া? কাকে কোনও দিন ভুলবি না? ছেলে বন্ধু বুঝি। ঢাকায় ফেলে এসেছিস?

ঝট করে খাতার আড়ালে চিঠি লুকিয়ে তানিয়া লজ্জাভরা গলায় বললো, কী আবোল তাবোল বকছিস প্রতিভা! ছেলে বন্ধু কেন হবে? চিঠি লিখছিলাম আমাদের আনন্দময়ী স্কুলের পারুলকে। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু!

প্রতিভার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনই ওরা তুমি থেকে তুইতে নেমে এসেছে। প্রতিভাই প্রথম বলেছে, নতুন স্কুলে আমি তোমার প্রথম বন্ধু। কী আপত্তি নেই তো?

তানিয়া বলেছে, বন্ধু হলে আর তুমি তুমি বলা কেন। তুই বললেই তো হয়।

তুই যদি বলিস তাহলে আমিও বলবো।

তুই যদি আপত্তি না করিস–

গত কদিনে ওদের সম্পর্ক আরও গম্ভীর হয়েছে। পারুলের কথা তানিয়া পরিচয়ের প্রথম দিনই প্রতিভাকে বলেছে। পারুলকে চিঠি লিখছে শুনে প্রতিভা বললো, কী লিখেছিস দেখাবি না?

পারুলের চিঠি, তুই কেন দেখবি!

ঠিক আছে। তানিয়ার বিছানায় বসে ভারি গলায় প্রতিভা বললো, আমি তোর কে? আমাকে কেন তোর বন্ধুকে লেখা চিঠি দেখাবি!

তানিয়া জানে কী অসম্ভব অভিমানী মেয়ে প্রতিভা। এরপর নিজে থেকে কথা বলবে না। তানিয়া কিছু জিজ্ঞেস করলে গম্ভীর হয়ে দায়সারা জবাব দেবে। নিজে কষ্ট পাবে, তানিয়াকেও কষ্ট দেবে।

তানিয়া হেসে খাতার নিচে লুকিয়ে রাখা চিঠিটা বের করে বললো, অমনি রাগ হয়ে গেলো! নে পড়।

প্রতিভা উদাস গলায় বললো, করুণা করছিস? চাই না তোর করুণা। তোর চিঠি তুই পড়গে।

চেয়ার থেকে উঠে প্রতিভার পাশে বসে তানিয়া বললো, তুই তো জানিস প্রতিভা, তুই যদি আমার ওপর রাগ করিস তখন আমার কী রকম খারাপ লাগে। প্লীজ, রাগ করিস না।

কোন অধিকারে তোর চিঠি পড়বো?

বন্ধু হওয়ার অধিকারে। পারুলকে আমি তোর কথা লিখেছি।

সত্যি! প্রতিভার সব রাগ কর্পূরের মতো উবে গেলো। দেখি তো কী লিখেছিস!

এক নিঃশ্বাসে চিঠি পড়া শেষ করে প্রতিভা আনন্দে আত্মহারা হয়ে–তুই আমাকে এত ভালোবাসিস, বলে জড়িয়ে ধরলো তানিয়াকে।

তানিয়া হাসলো, আরে ছাড় ছাড়। মিসেস পেরেরা দেখলে কী ভাববেন বলতো!

পাশের বিছানায় ঘুমোচ্ছিলো তানিয়াদের ক্লাসের ফারজানা। ওদের খুনসুটি শুনে কখন যে ওর ঘুম ভেঙেছে তানিয়ারা টের পায়নি। ফারজানা হাই তুলে বললো, তানিয়ার বন্ধু ভাগ্য দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

ফারজানার পাশের বিছানা থেকে চুমকি বললো, আমারও।

ফারজানা আর চুমকির কথা শুনে তানিয়ারা হাসতে হাসতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তানিয়ার চিঠি তখনও প্রতিভার হাতে। পিটি গ্রাউন্ডের পাশে কাঁঠাল গাছের নিচে বাধানো বেদিতে বসে তানিয়া বললো, চিঠিটা পোস্ট করতে দিয়ে দিই।

স্কুলের নিয়ম হচ্ছে ছাত্রীরা ওদের চিঠি খোলা খামে হোস্টেল সুপারের কাছে জমা দেবে। সব চিঠি সেন্সর হয়ে জায়গা মতো যাবে। তানিয়ার কথা শুনে প্রতিভা হেসে ফেললো–আসলে তুই এত সরল না! স্কুল সম্পর্কে যেসব কথা লিখেছিস এর পরও আশা করিস এ চিঠি ডাকে দেয়া হবে?

এসব কথা বাদ দিলে লিখবো কী। পারুলরা জানতে চাইবে না নতুন স্কুল কেমন?

তুই ভাবিস না। বনমালী আসার সময় হয়েছে, ওকেই দিস ঠিক মতো স্ট্যাম্প লাগিয়ে ডাক বাক্সে ফেলে দেয়ার জন্য।

শুক্রবারে ছুটির দিনটায় স্কুলের লৌহকঠিন শৃঙ্খলায় কিছু নরম থাকে। লৌহকঠিন শৃঙ্খলা শব্দটা মিসেস পেরেরা প্রায়ই ব্যবহার করেন। সামান্য অনিয়ম দেখলেই কপালের চামড়ায় কয়েকটা ভাঁজ ফেলে বলবেন, এটা শৃঙ্খলার ব্যাপার। আমাদের লৌহকঠিন শৃঙ্খলার ভেতর মানুষ হতে হবে। তবেই আমরা শক্ত মাটির ওপর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো।

ছুটির দিনের শেষ দুপুরে সারা স্কুল সুনসান। মেয়েরা সবাই যে যার বিছানায়। তানিয়ার চিঠি পড়ে প্রতিভার ভালো লেগেছে নিজের প্রসঙ্গটুকু, খারাপ লেগেছে স্কুলের ব্যাপারে তানিয়ার মন্তব্য। প্রতিভা মনে করে ভারতেশ্বরী হোমস-এর চেয়ে ভালো স্কুল বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। তানিয়াকে বললো, স্কুল কি তোর ভালো লাগছে না?

আমি কখনও বোর্ডিং-এ থাকিনি প্রতিভা। নিচু গলায় তানিয়া বললো, বায়োয়ারি বাথরুম পরিষ্কার করাটা আমার মোটেই ভালো লাগে না।

কোনও কাজকে ছোট ভাবতে নেই তানিয়া।

আমি ছোট কাজ বলছি না। আমার খারাপ লাগে তাই বলছি।

কিছুদিন পর দেখবি স্কুল ঠিকই ভালো লাগবে।

ঠিক আছে, তখন পারুলকে ভালো লাগার কথা লিখবো।

.

তানিয়ার মা মারা যাওয়ার পরই ওর বাবা ঠিক করেছিলেন মেয়েটার লেখাপড়া শেষ হলে ভালো একটা ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে নিজে শহরের পাট চুকিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকবেন। স্কুলের চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শহরে আর নয়। কদিন পরে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে একাই তো থাকতে হবে। তানিয়াকে বোর্ডিং স্কুলে দিলে একা থাকার সময়টা শুধু এগিয়ে আসবে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে তানিয়াকে ছেড়ে একা কিভাবে থাকবেন ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিলো ওর মা মারা যাওয়ার পর থেকে মেয়েটার সঙ্গে মোটেই ভালো ব্যবহার করেননি। আসলে স্নেহ মমতা সব কিছু থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ভালোবেসে কী লাভ যদি ধরে রাখা না যায়? তানিয়ার মাকে হারিয়ে বাবার জীবনটা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়েছিলো।

গ্রামে এসে ছেলেবেলার বন্ধু বিভূতিকে নিয়ে মাছ আর সবজির খামার আরম্ভ করলেন। খামার করতে গিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে ছুটির দিনে তানিয়াকে দেখতে যাওয়ার সময়ও তাঁর হয়নি। প্রতিভাদের বাড়ির বনমালী অবশ্য প্রতি শুক্রবার আসে। কাকীমা ওর হাতে টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি নাড়, নারকেলের চিড়া, নিমকি আর মোহনভোগ পাঠান। মোহনভোগটা রাখা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। নিমকি, নাড়, চিড়া–এগুলো কৌটোয় ভরে অনেক দিন রাখলেও নষ্ট হয় না। অনেক দিন রাখা সম্ভব হলেও রাখা যায় না। তানিয়া ছাড়াও প্রতিভার আরও বন্ধু আছে। ওদেরও দিতে হয়।

বিভূতিরঞ্জনের মতো ভালো মানুষ পৃথিবীতে দুটো থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করেন না তানিয়ার বাবা। তানিয়াকে স্কুলে রেখে ফেরার পথেই তিনি বন্ধুকে বলেছেন, নূরউদ্দিন শোন, ভেবে দেখলাম তোমার বাড়িটাই খামারের অফিস করার জন্য উপযুক্ত জায়গা। ভিটেটাতো পাকা আছেই। দুটো ঘর বাড়িয়ে দেয়াল তুলে ফেল। ওপরে টিনই থাকলো। খামারের অফিসটা মজবুত হওয়া দরকার।

আমি ভেবেছিলাম টাকা যেটা দেবে নদীর ধারে কয়েক বিঘা জমি লীজ নেবো। একটা পাহারাদারও রাখা দরকার। এত টাকা কোথায় পাবো? চিন্তিত গলায় কথাগুলো বলেছিলেন বাবা।

আমার এত জমি থাকতে লীজ নিতে যাবে কেন? পাহারাদার একটা নয়, দুটো লাগবে। দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পাহারা লাগবে। এ ছাড়া একজন পিয়নও লাগবে ছুটোছুটির কাজ করার জন্য।

পিয়নের দরকার হবে কেন? ছুটোছুটির কাজ আমিই করতে পারবো।

নিশ্চয় পারবে। তবে পিয়নের কাজে যে সময়টা ব্যয় করবে সে সময়টা যদি খামারের আয় বাড়ানোর জন্য মাথা ঘামাও সেটা অনেক লাভের ব্যাপার হবে। .

গ্রামে রাজমিস্ত্রি পাওয়া যাবে?

গ্রামে পাওয়া যাবে না। মিস্ত্রি, ইট, বালি সব মীর্জাপুর থেকেই আনতে হবে।

দুদিনের ভেতর জিনিষপত্র সব জোগাড় হয়ে গেলো। তিন দিনের মাথায় মিস্ত্রিরা কাজ আরম্ভ করলো। তানিয়ার বাবা আর বিভূতি কাকা–দুই বন্ধু মিলে সারাক্ষণ তদারক করলেন। বুয়ার ছেলে কালার চাকরি হয়ে গেলো খামারে। বুয়ার উৎসাহের অন্ত নেই। শুনেছে জমিদার বাবু ঘন ঘন চা খান। ডাক না পড়লেও ঘণ্টায় ঘন্টায় কালাকে ডেকে চা বানিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কতগুলো ঘটনার পর বিভূতিরঞ্জনের মনে হয়েছিলো রত্নেশ্বরীকে তিনি যত আপন ভাবুন, গ্রামের অনেক মানুষই তাঁকে আপন ভাবে না। ছেলেবেলার বন্ধু নূরউদ্দিনের সঙ্গে খামার করতে গিয়ে নতুন করে নিজের গ্রামটাকে আপন ভাবা আরম্ভ করলেন।

বাইশ দিন পর তানিয়াদের পুরোনো বাড়ির জায়গায় নতুন যে বাড়িটা উঠলো দেখে সবার চোখ জুড়িয়ে গেলো। রঙের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রতিমা আর ওর মা এসেছিলেন দেখতে। ছবির মতো সুন্দর বাড়িটা দেখে প্রতিমা বললো, বাবা তোমরা আলাউদ্দিনের প্রদীপ পেয়েছিলে? সেদিন কী দেখলাম আর এখন কী দেখছি!

বিভূতিরঞ্জন বললেন, মিস্ত্রি বেশি লাগিয়েছিলাম। রাজমিস্ত্রি আর কাঠমিস্ত্রি এক সঙ্গে কাজ করেছে।

তানিয়ার বাবা মৃদু হেসে বললেন, পানির মতো টাকাও খরচ করতে হয়েছে।

প্রতিমার মা বললেন, টাকা খরচ করলেই কি জিনিষ ভালো হয়! রুচিও থাকা দরকার।

বাড়ি বানাবার বাজেট প্রথমে দেড় লাখ ধরা হয়েছিলো। রঙের কাজ শেষ হওয়ার পর টাকার অঙ্ক দু লাখ ছাড়িয়ে গেলো। পুরোনো বাড়ির টিনগুলো শুধু কাজে লেগেছে। তারপরও ঘর বাড়ানোর জন্য নতুন টিন কিনতে হয়েছে। রঙ করার পর নতুন আর পুরোনো সব এক রকম হয়ে গেছে। পুরোনো

বাড়ির বাঁশের বেড়াগুলো টিনের নিচে সিলিং দেয়া হয়েছে। এতে গরম কম লাগবে। তানিয়ার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমও হয়েছে। তবে ইলেকট্রিসিটি আসা পর্যন্ত শাওয়ার আর বেসিনের কল ব্যবহার করা যাবে না, বালতির পানিতে কাজ সারতে হবে।

প্রতিমা ওর মাকে নিয়ে বাড়ির চারদিকে ঘুরে দেখলো। বুয়া মহা উৎসাহে ওদের বীজতলা পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনলো। পেঁপের চারা গজিয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় টিয়া পাখির পালক বিছিয়ে রেখেছে কেউ। তানিয়ার ঘরটাও ভালো লাগলো প্রতিমার। জানালা খুললে একদিকে বাঁশঝাড়, আরেক দিকে পুকুর। মনে মনে ভাবলো তানিয়া দেখলে খুবই অবাক হবে। বাবার কাছে শুনেছে তানিয়ার মা মারা যাওয়ার পর নূরু কাকু মেয়েকে নিয়ে কী কষ্টই না করেছেন।

প্রতিমার মা জানতে চাইলেন, গৃহপ্রবেশ কখন হবে নূরুদা?

তানিয়ার বাবা বিব্রত হলেন–প্রতিভা আর তানিয়া আসুক।

বিভূতিরঞ্জন বললেন, আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি রোজার বন্ধ শুরু হতে। তানিয়াকে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেয়া যাবে।

প্রতিমা বললো, বাবা, বনমালী আবার তানিয়াকে বলে দেয়নি তো?

না, আমি বারণ করে দিয়েছিলাম।

নূরুদা আপনি কি রোজা রাখেন? তানিয়ার বাবার কাছে জানতে চাইলেন প্রতিমার মা।

ছোটবেলায় মাঝে মাঝে রাখতাম। বড় হয়ে কখনও রাখিনি।

তাহলে গৃহপ্রবেশের রান্নাটা আমিই করবো। তানিয়া আর প্রতিভা যেদিন আসবে সেদিনই গৃহপ্রবেশ হবে।

০৭-৮. গৃহপ্রবেশের উৎসবে চমক

৭. গৃহপ্রবেশের উৎসবে চমক

তানিয়া আর প্রতিভাকে অবাক করে দেয়ার সব ব্যবস্থাই করা হয়েছিলো নতুন বাড়িতে। আগে থেকে তানিয়াদের বলা হয়েছিলো যেদিন থেকে ছুটি শুরু হবে সেদিন ভোরে বনমালী ওদের নিয়ে যাবে। প্রতিভা একটু অবাক হয়ে বলেছিলো, আমরা তো বিকেলে স্কুল ছুটির পরই যেতে পারি। রাতটা হোস্টেলে কাটাবার কী দরকার?

বনমালী গম্ভীর হয়ে বলেছে সদরে ওর কাজ আছে। ফিরতে রাত হবে। তাই পরদিন ভোরে আসবে।

সেবার রোজার একদিন আগে স্কুল ছুটি হয়েছিলো। লম্বা ছুটির সময় হোস্টেলের সবাইকে বাড়ি যেতে হয়। কারও গার্জেন আসতে যদি দু তিন দিন দেরি হয় তাহলে সে কদিন তারা থাকতে পারে।

ছুটির দিন প্রথম হুইসেল বাজলো না। বিউগলের শব্দ শোনা গেলো না। তবু সূর্য ওঠার আগেই তানিয়ার ঘুম ভাঙলো। লম্বা হল ঘরে যেখানে ওরা চল্লিশ জন থাকে সেখানে রাতে ছিলো এগারো জন। অন্যরা আগের দিন বিকেলেই চলে গেছে। যারা বাকি আছে তারাও আজ চলে যাবে।

এত দিনে তানিয়া হোস্টেল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। স্কুলটাকেও ভালো লাগা শুরু হয়েছে। প্রথমে যেটা মনে হয়েছিলো শেকল বাঁধা জীবন পরে দেখেছে সব কিছুর ভেতর একটা ছন্দ আছে। ঘড়ির কাঁটা যেরকম নিয়ম মেনে ঘোরে এখানেও সব কিছু চলে ঘড়ির কাঁটার মতো। ক্লাসে পোষাক থাকে পরিপাটি, ক্ষিদেয় কষ্ট পেতে হয় না, বখাটে ছেলেদের ভয়ে আধখানা হয়ে থাকতে হয় না তানিয়ার মনে হয়েছে খুবই নিরাপদ আর সুন্দর পরিবেশে এসেছে ও। পারুলকে এক সপ্তাহ পরেই ওর এই ভালো লাগার কথা লিখেছিলো। জবাবে পারুল লিখেছে, এখন থেকে তুই আমাদের ভুলতে শুরু করবি। তানিয়া উত্তর দিয়েছে, অন্যদের কথা জানি না, তোকে কোনও দিন ভুলে যাবো এ কথা তুই ভাবতে পারলি?

বনমালী সাতটার সময় এসে হাজির। তানিয়া আর প্রতিভা আগে থেকেই ওদের ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে বসেছিলো। বনমালীকে দেখে ওরা হইচই করে উঠলো। নৌকায় যেতে যেতে তানিয়া বললো, আমি ভেবেছিলাম বাবা নিতে আসবেন।

প্রতিভা বললো, গত সপ্তায় বনমালী বললো না, বাবা আর কাকু দুজনই খামারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

তোকে বলেছি প্রতিভা, খামারে আমি হাঁস মুরগি পুষবো?

যখন বাচ্চা থাকে তখন দারুণ লাগে। বড় হয়ে ঘর নোংরা করে।

ঘরে আসবে কেন? ওদের আলাদা জায়গা থাকবে।

তোর হাঁসের বাচ্চা হলে আমাকে দিবি?

কেন দেবো না! তানিয়া হেসে বললো, তবে হোস্টেলে মিসেস পেরেরা দেবেন কিনা আমি জানি না।

তানিয়ার কথা শুনে প্রতিভাও হাসলো–বাইরে কড়া মনে হলেও মিসেস পেরেরার মনটা ভারি নরম।

তানিয়া একটু পরে বললো, এবারের ছুটিটা দারুণ মজার হবে। প্রতিভা কোন কথা না বলে অর্থপূর্ণ হাসলো।

ফারুনের কুয়াশাভেজা সকালে নৌকার ছইয়ের নিচে বসে গল্প করতে করতে দুটো ঘন্টা যে কিভাবে কেটে গেলো তানিয়া টেরও পেলো না। কুয়াশা এমনই ঘন ছিলো প্রকৃতির দৃশ্য দেখার চেষ্টা করে ওরা সুবিধে করতে পারেনি। দৃশ্য দেখার জন্য প্রতিভার তেমন তাড়া ছিলো না। তবে তানিয়ার কাছে এসব শুধু অভিনব নয়, অপরূপও বটে।

বনমালী আসার পথেই প্রতিভাকে বলেছিলো দুপুরে সবাই তানিয়াদের বাড়িতে খাবে। বাবু বলে দিয়েছেন তানিয়ার সঙ্গে প্রতিভাও যেন ওদের বাড়ি চলে আসে।

বাড়ি দেখে তানিয়ার পা সরে না । উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মূর্তির মতো। মনে হচ্ছিলো ও স্বপ্ন দেখছে! ছবির মতো বাংলোটা প্রতিভার দেখতে ভালো লাগলেও তানিয়ার অবাক হওয়ার কারণ ও বুঝতে পারলো না। বললো, কি রে তানিয়া, এত অবাক হয়ে কী দেখছিস?

প্রতিভার হাত চেপে ধরে তানিয়া ফিশ ফিশ করে বললো, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! এটা কি সত্যিই আমাদের বাড়ি!

হালকা খয়েরি দেয়ালের বাড়িটার ওপর সবুজ টিনের চাল, দরজা জানালা সব সাদা, নতুন পর্দা ঝুলছে সেখানে, সামনে ঢাকা বারান্দা, লাল সিমেন্টের মেঝে–যেমনটি শুধু ছবিতে দেখা যায়।

বসার ঘর থেকে বাবা আর বিভূতি কাকা বেরিয়ে এলেন। তাদের পেছনে কাকীমা আর প্রতিমাদি। বাবা এগিয়ে এসে বললেন, বাড়ি কেমন লাগছে তানিয়া?

বহুদিন পর বাবাকে জড়িয়ে ওঁর বুকে মাথা রেখে তানিয়া ধরা গলায় বললো, বাবা, আজ যদি মা থাকতেন–। কথা শেষ করতে পারলো না ও। কান্নায় গলা বুজে এলো ।

প্রতিমা এসে তানিয়ার হাত ধরলোভেতরটা দেখবি না তানিয়া? তোর ঘরটা যা সুন্দর দেখতে হয়েছে না!

কান্না সামলে প্রতিমার সঙ্গে তানিয়া ওর ঘরে গেলো। প্রতিভা ওর মাকে বললো, তানিয়া নিশ্চয় এ বাড়ি দেখে যায়নি মা?

না! ওকে সারপ্রাইজ দেবে বলে তোর নূরু কাকু আর বাবা দুজন তোদের কিছুই জানায়নি।

নূরু কাকুর কথা শুনেই প্রতিভা জিভ কামড়ে ছুটে গেলো ওঁকে প্রণাম করতে। তানিয়ার বাবাকে আগে কখনও দেখেনি ও। তিনি যখন গ্রামে আসেন প্রতিভা তখন স্কুলে থাকে। তাকে চমকে দিয়ে প্রতিভা র পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

তানিয়ার বাবা অপ্রস্তুত হয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বিড় বিড় করে বললেন, চির সুখী হও মা।

ঘর দেখে তানিয়া বললো, আমাদের কখনও এত সুন্দর বাড়ি হবে আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি প্রতিমাদি। আমি এখনও ভাবতে পারছি না এ বাড়ি আমাদের।

তোকে আমরা এর চেয়ে সুন্দর বাড়িতে বিয়ে দেবো।

প্রতিমার রসিকতায় কান না দিয়ে তানিয়া বললো, তুমি কি জানো প্রতিমাদি, এত সুন্দর বাড়ি বানাবার টাকা বাবা কোথায় পেয়েছেন?

তোকে বলা হয়নি। বাবা আর নূরু কাকু পার্টনারশিপে কোম্পানি খুলেছেন। বাড়িটা কোম্পানির টাকায়। সামনের খালি ঘরটা হবে কোম্পানির অফিস।

কোম্পানি টাকা পেলো কোথায়?

নগদ টাকা বাবার। নূরু কাকুর পুকুর আর জমি। তোকে অবাক করে দেবেন বলে নূরু কাকু একদিন তোকে কিছু বলেন নি।

বাবা এখনও ওর জন্য আগের মতো ভাবেন, আগের মতো ভালোবাসেন কথাটা মনে হতেই তানিয়ার বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে উঠলো। প্রতিমা বললো, তুই আজ আসবি বলে নূরু কাকু গৃহপ্রবেশের ভোজও আজ দিচ্ছেন।

তাহলে তো রান্নাঘরে গিয়ে বুয়াকে সাহায্য করতে হয়। ও একা পেরে উঠবে না।

রান্নাঘরে মা কাউকে ঢুকতে দেবেন না আগেই বলে দিয়েছেন। বুয়া রান্নাঘরের বারান্দায় বসে মশলা বাটছে। সকাল থেকে বুয়ার ছেলের বউও এসে কাজে লেগেছে।

ছেলের বউয়ের সঙ্গে বুয়ার বুঝি ভাব হয়ে গেছে?

সে কথা আর বলতে! বউ এখন বুয়াকে মা বলতে অজ্ঞান। কালার চাকরি হয়েছে কোম্পানিতে। নূরু কাকু কালার বউকে বলেছেন, তোমার শ্বাশুড়ির সুপারিশে কালাকে চাকরি দিচ্ছি। যেদিন ও ছাঁটাই করতে বলবে সেদিনই চলে যেতে হবে। তারপর থেকে শাশুড়িকে মাথায় তুলে রেখেছে বউ। কোনও কাজই করতে দেয় না।

প্রতিমা আর প্রতিভাকে নিয়ে তানিয়া ঘুরে ফিরে বাড়িটা বার বার দেখলো। ওর ঘরের পাশের বাথরুমটাও তানিয়ার ভালো লাগলো, যদিও প্রতিমাদের শ্বেত পাথরের বাথরুমের পাশে এটা কিছুই নয়। বুয়া ওদের চা আর ঘরে বানানো খেজুরি পিঠে রেখে গেলো। আধখানা আঙুলের সাইজের তেলে ভাজা বাইরের দিকটা মুচমুচে, ভেতরটা নরম মিষ্টি খেজুরি পিঠে যে তানিয়া খুব পছন্দ করে এটা বুয়ার অজানা নয়। বললো, তোমরা আইজ আইবা শুইন্যা কাইল রাইতে বানায়া রাখছিলাম।

একটা পিঠে মুখে ফেলে তানিয়া হেসে বললো, খুব মজার হয়েছে। ছুটির পর যখন স্কুলে যাবো তখন টিন ভর্তি করে বানিয়ে দেবে।

হ, তোমার লাইগা এক টিন আর এই ছোট্ট পরিটার লাইগা এক টিন। এই বলে প্রতিভার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বুয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

চা খেতে খেতে তানিয়া বললো, এত টাকা পয়সা খরচ করে বাবারা যে কোম্পানি খুললেন, লাভ টাভ হবে তো!

মুখ ভর্তি পিঠে নিয়ে প্রতিভা বললো, কোম্পানি নিয়ে মাথা ঘামানোর কাজটা বাবারাই করুক না। তুই পুঁচকে মেয়ে নাক গলাচ্ছিস কেন?

আজ না হলে কাল মাথা ঘামাতেই হবে। ছুটির যে কদিন বাড়িতে থাকবো সে কদিন বাবাদের খামারে কাজ করলে নিশ্চয় কোম্পানির লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।

তুই বুঝি সারাদিন খামার নিয়ে কাটাবি? প্রতিভাকে একটু মনক্ষুণ্ণ মনে হলো। আমরা যে ঠিক করলাম ছুটির দিন বনমালীকে নিয়ে– এটুকু বলে আড় চোখে প্রতিমাকে দেখে প্রতিভা আর কথা বাড়ালো না।

প্রতিমা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, ছুটির দিন কী করবি ভেবেছিলি তোরা?

প্রতিভা আর তানিয়া নিজেদের ভেতর দৃষ্টি বিনিময় করলো। কথাটা প্রতিমাকে বলা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছিলো না ওরা।

তানিয়া, ছুটির দিনে বনমালীকে নিয়ে কী করতে চেয়েছিলি তোরা? প্রতিমার গলায় কিছুটা কর্তৃত্ব প্রকাশ পেলো।

সামান্য ইতস্তত করে তানিয়া বললো, প্রতিভা বলছিলো তোমাদের পুরোনো বাড়িতে খুঁজলে নাকি অনেক গুপ্তধন পাওয়া যাবে।

তানিয়া, তুই-ই তো বলছিলি পুরোনো ভাঙা জমিদার বাড়িতে গুপ্তধন পাওয়া যায়। গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ায় তানিয়ার ওপর রাগ হলো প্রতিভার।

আমি বইয়ে পড়েছি। আগেকার দিনে তো ব্যাংক ছিলো না। বড়লোকরা টাকা, মোহর এসব মাটিতে পুঁতে রাখতে।

প্রতিমা বললো, কথাটা তুই মিথ্যে বলিসনি তানিয়া। ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছে শুনেছি আমাদের এক পূর্বপুরুষের নাকি ছেলেপুলে না হওয়াতে সব টাকা যখের পাহারায় পুরোনো মহলের কোথাও লুকিয়ে

রেখেছিলেন। তবে যারাই সেসব খোঁজার চেষ্টা করেছে তারা সবাই যখের হাতে প্রাণ দিয়েছে। শেষবার মারা গেলো আমাদের এক দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই। প্রতিভা তখন খুব ছোট ছিলো।

যখের কাছে টাকা কিভাবে পাহারা রাখে প্রতিমাদি? অবাক হয়ে জানতে চাইলো তানিয়া।

জানিস না বুঝি! কাষ্ঠ হেসে প্রতিমা বললো, আগেকার দিনে যারা চাইতো না তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদের টাকা পয়সা উড়িয়ে দিক তখন তারা যখের কাছে পাহারা রাখতো।

যখ কে তাই বলো না?

যখ হলো অপদেবতা। টাকা পয়সা সোনাদানা সব কলসি বোঝাই করে মাটির তলায় একটা ঘরে রাখতো। তারপর কোনও ব্রাহ্মণের নাবালক ছেলেকে সেই ঘরে রেখে চিরদিনের জন্য বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতো। এই ছেলেই মরে গিয়ে যখ হয়ে সম্পত্তি পাহারা দেয়। কেউ যদি চুরি করতে আসে যখের অভিশাপে তারা মুখে রক্ত উঠে মরে যায়।

প্রতিমার কথা শুনে তানিয়ার গায়ে কাঁটা দিলো। বাইরে তখন ঝলমলে রোদ। বাতাসে তির তির করে কাঁপা পুকুরের পানিতে হাজার হাজার রোদের ফুলকি ঝলমল করছে। তারপরও ফাল্গুনের বাতাস তানিয়ার বুকে কাঁপন ধরালো। বললো, তুমি বলতে চাও তোমাদের পূর্বপুরুষ একটা ছোট ছেলেকে মাটির নিচের ঘরে জ্যান্ত আটকে রেখে মেরে ফেলেছিলেন?

নইলে যখ হবে কেমন করে?

দিদির এসব ভয় ধরানো কথা প্রতিভার একটুও পছন্দ হলো না। নিজে ভয়কাতুরে বলে সবাইকে ও ভয় দেখাতে ভালোবাসে। একটু বিরক্ত হয়ে বললো, এসব যখের গল্প তুই আগেও করেছিস দিদি। মাটির নিচের বদ্ধ ঘরে কার্বন ডাই অক্সাইড কিংবা অন্য কোনও বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকতে পারে। আগে থেকে সাবধান না হলে মানুষ বিষাক্ত গ্যাসের কারণে মারাও পড়তে পারে। ওসব যখটখ হলো নিতান্তই বিষাক্ত গ্যাস।

দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে সব কিছু জেনে ফেলেছিস, তাই না? জেনে রাখিস বিজ্ঞানে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা অহরহ ঘটছে।

ব্যাখ্যা এখন পাওয়া না গেলে ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে না এ কথা কে বললো?

তুই কি ভগবানেও বিশ্বাস করিস না?

না দেখে বিশ্বাস করি কিভাবে?

এ রাম! তুই নাস্তিকের মতো কথা বলছিস প্রতিভা। তোর পাল্লায় পড়লে তানিয়াও নষ্ট হয়ে যাবে।

গুপ্তধনের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ভগবানে বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে যেভাবে প্রতিমা আর প্রতিভা তর্কে মেতে উঠেছে–তানিয়ার ভালো লাগলো না। বললো, শোন প্রতিমাদি, আমরা মাটির নিচে যখের ধনের দিকে হাত না বাড়িয়ে অন্য কোথাও তো খুঁজতে পারি। অনেক সময় বাড়ির দেয়ালেও গর্ত খুঁড়ে মোহরের কলসি রেখে দেয়াল এমনভাবে বুজিয়ে দেয় কেউ টেরও পায় না।

নিশ্চয় কোনও বইয়ে পড়েছিস?

না ঘটলে বইয়ে লিখবে কিভাবে?

শোন দিদি! গম্ভীর গলায় প্রতিভা বললো, কথাটা আমি অনেক দিন ভেবেছি। তুই একটা ভীতুর ডিম বলে আগে তোকে বলিনি। আমাদের পুরোনো মহলের ভেতর বার আমি ভালো মতো দেখতে চাই। আমার একজন সঙ্গী দরকার ছিলো, তানিয়াকে পেয়েছি। তুই যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাস তো ভালো। না থাকলেও ক্ষতি নেই। তবে বাবা যদি জানতে পারেন তোর সঙ্গে আমার জন্মের আড়ি। বল, থাকবি কি থাকবি না?

থাকতে পারি এক শর্তে। প্রতিমা কর্তৃত্বভরা গলায় বললো, আমাকে লিডার মানতে হবে। আমার কথার বাইরে কেউ কিছু করতে পারবি না।

প্রতিভা একটু ভেবে বললো, তুই লিডার হতে পারিস, তবে ডিক্টেটরের মতো কথা বললে চলবে না। কোনও ব্যাপারে এক মত না হলে আমরা ভোটাভুটি করবো। মেজরিটির সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে।

তাহলে তো তোরা দুজন জোট বেঁধে আমাকে সব সময় হারিয়ে দিবি।

তানিয়া বললো, প্রতিভার সব কথায় আমি সায় দেবো এটা কেন ভাবছো প্রতিমাদি? আমার নিজেরও তো একটা মত থাকতে পারে। তার সঙ্গে হয়তো তোমারই মতের মিল হলো, প্রতিভার সঙ্গে মিললো না। এমন হতেই পারে।

হাসি চেপে প্রতিভা রেগে যাওয়ার ভান করলো তবে রে তানিয়া, তোর মনে এই ছিলো! আমার সঙ্গে এতদিন সব প্ল্যান করে দিদির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিস? এই বলে তানিয়ার পিঠে কিল মারার জন্য হাত তুললো।

তানিয়া আঁতকে উঠে লাফিয়ে খাট থেকে নামলো। তারপর বাঁধভাঙা পাহাড়ি ঝর্ণার মতো হাসতে হাসতে ছুটে পালালো। প্রতিভাও ওর পেছন পেছন ছুটলো। প্রতিমা ধীরে সুস্থে বারান্দায় এসে দেখে তানিয়ারা বাঁশ ঝাড়ে ছুটোছুটি করছে।

প্রতিমার বাবা আর তানিয়ার বাবা বারান্দায় বেতের টেবিলে দাবার বোর্ড মেলে বসেছিলেন। প্রতিমাকে দেখে ওর বাবা লোভী গলায় বললেন, তোর মা রান্নাঘরে মাংশের বড়া ভাজছে। এখান থেকে গন্ধ পাচ্ছি। কটা বড়া আনতো মা, গরম গরম খাই।

প্রতিমা হেসে বললো, সঙ্গে চা-ও নিশ্চয়ই চাই।

চায়ের জন্য তোকে ভাবতে হবে না। বুয়া জানে আমার যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চায়ের তেষ্টা পায়।

প্রতিমা রান্নাঘরে এসে দেখে মা একটা মোড়ার ওপর বসে আছেন। বুয়া বড়া ভাজছে। এক পাশে মোক্ষদাদি বটি পেতে তরকারি কুটছে। মাকে বললো, বাবা আর নূরু কাকুর জন্য কটা বড়া নেবো মা?

নে না। মা মৃদু হেসে বললেন, নিশ্চয়ই তোর বাবা চেয়েছেন।

মিটসেফের ওপর থেকে একটা প্লেট নামিয়ে এতে টমেটো সস ঢেলে বড়া সাজাতে সাজাতে প্রতিমা বললো, এত কে খাবে মা? তুমি যে রীতিমতো ভোজের আয়োজন করছে!

তোর নূরু কাকু বললেন, স্কুলের টিচাররা সবাই আসবেন। ওঁদের পুরোনো বন্ধুও আসবেন কয়েকজন। পাশের বাড়িতে তানিয়ার চাচা চাচীরা রয়েছেন।

বুয়া বললো, বাবুরে কইয়ো, আমি একটু পরে চা লইয়া আইতাছি।

বাবু জানে। বলে প্রতিমা হাসতে হাসতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বারোটার পর থেকেই মেহমান আসা শুরু হলো। গ্রামে একটাই স্কুল, যেখানে প্রতিমার বাবাও শখ করে মাস্টারি করেন। স্কুলের টিচার এলেন জনা পনেরো। তানিয়ার মা নেই বলে টিচাররা কেউ তাদের স্ত্রীদের আনেননি। পাশের বাড়ি থেকে শুধু লাইলি আর রাজন এসেছে। চাচা চাচী আসেননি। চাচা চাচী কেন আসেননি জিজ্ঞেস করায় তানিয়াকে আড়ালে নিয়ে লাইলি চাপা গলায় বলেছে, বাবায় মানা করছে মারে আইতে। কয় হিন্দুরা রানতাছে, নাপাক জিনিষ।

তানিয়া বিরক্ত হয়ে বলেছে, তোরা যে এলি! তোদের জাত যাবে না?

আমি মারে কইছি ঘোষে গো দোকান থেইকা যে মিষ্টি কিন্যা খাও তখন নাপাক মনে হয় না!

তানিয়া এ নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। তবে আজিমউদ্দিন না আসায় তানিয়ার বাবা মনে মনে খুশি হয়েছেন। কারণ গৃহপ্রবেশের দিনই সবার কাছে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথাটা জানাতে চান।

পাশের দুই গ্রাম থেকে বাবার তিনজন মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুও এসেছেন। পুরোনো বন্ধুদের বেশির ভাগই দেশ ছাড়া। ঢাকা আর চট্টগ্রামে আছে পাঁচ ছয় জন। গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে দু তিন বছরে একবার দেখা হলেও শহরের বন্ধুরা এত ব্যস্ত যে ঢাকায় থেকেও আঠারো উনিশ বছর কারও সঙ্গে দেখা নেই।

প্রতিমা লক্ষ্য করেছে বাবার মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা একত্র হলেই মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুরু করেন। তোর মনে আছে কমলপুর থানা অপারেশনের কথা বলে শুরু হয় গল্প। কমলপুর না হলে অন্য কোনও নাম–গল্পের শেষ নেই।

সবাই অফিস ঘরের মেঝেতে শতরঞ্জির ওপর বসেছিলেন। শতরঞ্জিগুলো প্রতিমাদের বাড়ি থেকে আনা। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনার আশায় প্রতিমা দরজার আড়ালে চেয়ার টেনে বসেছে।

তানিয়ার বাবা মুক্তিযুদ্ধের কথা না বলে ভিন্ন প্রসঙ্গ তুললেন–তোমাদের আজ বিশেষ একটা কাজে দাওয়াত দিয়েছি। এই বলে সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, তোমরা তো জানো, আমাদের আর আশেপাশের তিন গ্রামে মেয়েদের কোনও স্কুল নেই। আমাদের স্কুলে তবু ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত মেয়েরা পড়ে, তারপর আর পড়ার সুযোগ নেই। মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী হোমস-এ রেখে মেয়ে পড়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই বললেই চলে।

নিয়ামতপুরের মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু ইকবাল আহমেদ বললেন, আমি এরশাদের আমলে অনেক চেষ্টা করেছি। জাতীয় পার্টির এমপিকেও ধরেছিলাম। বলে রওশন এরশাদের নামে করলে গার্লস স্কুল হতে পারে। এখনকার এমপি বলছে খালেদা জিয়ার নামে করতে। আমি বলেছি নেতা নেত্রীদের কারও নামে স্কুল করতে রাজী নই আমি।

বিভূতিরঞ্জন বললেন, শুরুটা আমরা নিজেদের উদ্যোগেই তো করতে পারি। পরে স্কুল দাঁড়ালে সরকারের সাহায্যের জন্য যাবো। নইলে গদি বদলের সময় স্কুলের নামও কয়েক বছর পর পর বদলাতে হবে।

তাঁর কথা শুনে বন্ধুরা হাসলেন–ঠিক বলেছো বিভূতি! সেই স্কুলে তুমি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসও পড়াতে পারবে না। একেক সরকার একেকভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে ফুটবল খেলছে।

বিভূতিরঞ্জন বললেন, নূরউদ্দিনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। স্কুলের জন্য আমি নদীর ধারে আমাদের তিন একর জমি লিখে দেবো। নতুন বিল্ডিং না ওঠা পর্যন্ত আমাদের বাড়ির নিচের তলায় ক্লাস হবে। বারোটা কামরা আমি ছেড়ে দিতে পারি।

ইকবাল আহমেদ জানতে চাইলেন–স্কুলটা কার নামে হবে?

গম্ভীর গলায় বিভূতিরঞ্জন বললেন, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বন্ধু আশফাঁক শহীদ হয়েছিলো। আশা করি ওর কথা তোমাদের মনে আছে। স্কুলের নাম হবে শহীদ আশফাঁক মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।

মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকালেন। তাদের বন্ধু আশফাঁকের কথা সবাই ভুলেই গিয়েছিলেন। আশফাঁকের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর ছবি সবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। দারুণ প্রাণবন্ত ছিলো আশফাঁক। সারাক্ষণ ক্যাম্পের সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে কারও কারও চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তানিয়ার বাবা বললেন, আশফাঁকের মা এখনও বেঁচে আছেন। গত সপ্তাহে বিভূতি আর আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওঁকে দিয়েই আমরা স্কুল উদ্বোধন করবো।

বিভূতিরঞ্জনদের স্কুলের বাংলার টিচার নলিনী গুহ বললেন, বিভূতি বাবু, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন মহান শহীদের নামে স্কুল হবে, এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমি বলি কি, স্কুলের নামটা বাংলায় করলে কেমন হয়? যদি বলি শহীদ আশফাঁক স্মৃতি বিদ্যা নিকেতন?

বিভূতিরঞ্জন বললেন, বাংলায় শুনতে অনেক ভালো লাগছে নলিনী বাবু। ঠিক আছে বাংলা নামই হবে।

ইংরেজির টিচার লুফুল হায়দার বললেন, গার্লস স্কুলের বাংলা হবে বালিকা বিদ্যালয়।

নলিনী গুহ বললেন, আমরা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছেলেমেয়ে দুটোই পড়াই না কেন আমাদের স্কুলের মতো? সিক্স থেকে শুধু মেয়েরা পড়বে।

বিভূতিরঞ্জন বললেন, এটাও ভালো প্রস্তাব, নূরউদ্দিন, তোমার মত কী?

তানিয়ার বাবা বললেন, নলিনী বাবুর দুটো প্রস্তাবই ভালো। আমি মনে করি এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত করবে না।

সবাই সমস্বরে বললেন, না না, দ্বিমতের কী আছে।

এরপর সবাই আলোচনা করলেন স্কুল কমিটি নিয়ে। সবাই একবাক্যে কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিভূতিরঞ্জনের নাম প্রস্তাব করলেন। মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে তানিয়ার বাবার নাম প্রস্তাব করা হয়েছিলো। তিনি ঘোরতর আপত্তি করলেন এটা শুধু আমাদের গ্রামের স্কুল নয়। তিন গ্রামের সবাই মিলে স্কুলটা গড়ে তুলতে হবে। আমি নতুন খামারে হাত দিয়েছি। তেমন সময় দিতে পারবো না। আমি প্রস্তাব করছি ইকবাল আহমেদ মেম্বার

সেক্রেটারি হবে। স্কুলের ব্যাপারে ও অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে।

তানিয়ার বাবার যুক্তি সবাই মেনে নিলেন। ইকবাল আহমেদ শুধু বললেন, মেম্বার সেক্রেটারি কথাটা কি ঠিক হলো নলিনী বাবু?

মৃদু হেসে নলিনী গুহ বললেন, সদস্য সচিব বললে ভালো শোনায়।

.

৮. গুপ্তধনের সন্ধানে

রতেশ্বরী গ্রামের রায়দের পুরোনো মহলকে লোকে বলে ভূতের টিলা। প্রতিমাদের বাড়ি থেকে হেঁটে গেলে মিনিট পনেরো লাগে। ধ্বংসস্তূপের ভেতরও কতগুলো ঘরের কাঠামো দাঁড়ানো ছিলো। দোতালার অনেকখানি ছাদ ভেঙে পড়লেও একতলার কয়েকটা ঘরে ছাদ ছিলো। দরজা জানালার জায়গায় বড় গহ্বরের মতো, জংলি লতা আর ঝোঁপ ঝাড়ে ছেয়ে গেছে। সব। দূর থেকে দেখলে মনে হয় গাছগাছালি ঢাকা উঁচু টিলা। মহলের পুব দিকটা পুরোটাই ধ্বসে পড়ে টিলার আকার নিয়েছে।

দুপুর তখন ঠিক বারোটা। প্রতিমা, তানিয়া আর প্রতিভা পুরোনো মহলের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় বসে টিফিনের খাবার খাচ্ছিলো। তানিয়াকে গ্রাম দেখাবে বলে প্রতিমা আর প্রতিভা বাড়ি থেকে বেরুবার ছাড়পত্র পেয়েছে। মা বলেছিলেন বনমালীকে সঙ্গে নিতে। প্রতিমা রাজী হয়নি। সন্ধ্যে বা রাত হলে না হয় কথা ছিলো। দিনের বেলা পেয়াদা নিয়ে হাঁটলে গ্রামের লোক ঠাট্টা করবে। মা বলে দিয়েছেন যেখানেই যাক দুটোর আগে ফেরা চাই। তানিয়া যেন দুপুরে খেয়ে যায়। তানিয়া অবশ্য বাড়িতে বলেছে সারাদিন ও প্রতিভাদের সঙ্গে কাটাবে। বাবা আর বিভূতি কাকা খামার আর স্কুলের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে মেয়েরা নিজের মতো সময় কাটাচ্ছে দেখে মনে মনে ওঁরা খুশিই হয়েছিলেন।

প্রতিমা ওর কাঁধের ঝোলা ব্যাগে পানির বোতল আর খাবার নিয়েছে। প্রতিভা নিয়েছে ওর ঠাকুরদার গুপ্তি লাঠি। দেখতে বেড়াবার ছড়ির মতো, ভেতরে সরু বেয়নেটের ফলার মতো অস্ত্র লুকোনো থাকে। হাতলের বোতামে চাপ দিলে অস্ত্রটা বেরিয়ে আসে। তানিয়া সঙ্গে এনেছে একটা ড্রইং খাতা আর পেন্সিল। বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই ওরা ঠিক করেছে পুরোনো মহলের একটা নকশা তৈরি করতে হবে।

দু ঘন্টা ধরে দোতালার যে সব দেয়াল দাঁড়িয়েছিলো প্রতিভা লাঠি ঠুকে ঠুকে দেখেছে কোথাও ফাপা শব্দ হয় কিনা। দোতালায় তেমন কোনও আলামত পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ এক টানা হাঁটার পর ওরা যখন পুরোনো মহলের নাট মন্দিরের চাতালে বসলো, তখনই প্রতিভা বললো, দিদি, ব্যাগে করে কী এনেছিস বের কর। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

তানিয়া বললো, এই ফাঁকে আমি নকশার কাজটা সেরে নিতে পারি।

আগে কিছু মুখে দে! প্রতিমা ওর ব্যাগ থেকে মাংশের বড়া আর ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কিট বের করলো। সঙ্গে কলাও এনেছিলো।

খেতে খেতে প্রতিভা বললো, আমাদের স্কুলের টিফিনের মতো মনে হচ্ছে না তানিয়া?

টিফিনে তোকে মাংশের বড়া দেবে? তবেই হয়েছে।

প্রতিমা বললো, একটা ভুল করে ফেলেছি।

কী ভুল? একসঙ্গে প্রশ্ন করলো তানিয়া আর প্রতিভা।

ফ্লাস্কে চা বানিয়ে রান্নাঘরে রেখে এসেছি।

সারাক্ষণ বাবার মতো চা চা করবি না তো দিদি! এই ভর দুপুরে চা খেতে বয়েই গেছে।

তানিয়া চারপাশে তাকিয়ে বললো, মনে হচ্ছে বহু বছর পর এখানে মানুষের পা পড়লো।

প্রতিমা বললো, আমাদের মামাতো ভাইটা এসেছিলো চোদ্দ পনেরো বছর আগে। ও মারা যাওয়ার পর ভুলেও কেউ এ বাড়ির ছায়া মাড়ায়নি।

খাবার শেষ করে নকশা আঁকতে গিয়ে পশ্চিম দিকে এসে আটকে গেলো তানিয়া। পশ্চিমের দিকটায় কামরার ছাদ এখনও ভেঙে পড়েনি। নকশা আঁকার জন্য জায়গাটা আবার দেখা দরকার। বললো, প্রতিমাদি, পশ্চিমের ওদিকটা ভালো মতো দেখতে চাই।

মুখ টিপে হেসে প্রতিমা বললো, চল যাই। তুই দেখছি গুপ্তধন বের না করে ছাড়বি না।

ক্ষয়ে যাওয়া লাল সুড়কির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে প্রতিমা বললো, এ বাড়ির সিঁড়ি মেঝে সব দামী ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের ছিলো। অনেক দিন ধরে চোররা পাথর চুরি করেছে। যা বাকি ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সময় লোপাট হয়েছে।

পশ্চিমের ঘরে ঢুকে তানিয়া লক্ষ্য করলো অন্য সব ঘরের চেয়ে এখানে জঞ্জাল কম। কথাটা প্রতিমাকে বললেও তেমন গুরুত্ব দিলো না ও–এ ঘরে ছাদ আছে তাই আবর্জনা কম। ওদিকের ঘর তো ছাদ ভাঙা রাবিশে ভরে আছে।

পাশের ঘরের সঙ্গে মিলিয়ে এ ঘরের দরজা জানালার নকশা আঁকতে গিয়ে তানিয়া লক্ষ্য করলো জানালা থেকে বংশী নদীটা চমৎকার দেখাচ্ছে। প্রতিমা বললো, এ বাড়ির অন্দর মহলের জানালা দরজায় নানা রঙের কাঁচ বসানো ছিলো। বন্ধ দরজা জানালার ওপর যখন রোদ পড়তো ঘরের ভেতর মনে হতো হোলির উৎসব হচ্ছে।

ওপরে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে দেখলো তানিয়া। ছাদের ওপর গজানো বট গাছের শেকড় জালের ভেতর ছড়িয়ে রয়েছে সারা সিলিং আর দেয়ালে। প্রতিভা লাঠি ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছিলো–কোথাও অন্যরকম শব্দ হয় কি না। হঠাৎ ও বললো, দিদি, এটা এলো কোত্থেকে?

প্রতিমা আর তানিয়া ওর দিকে এগিয়ে গেলো-ওটা কী?

প্রতিভার হাতে ধরা আধখানা পোড়া সিগারেট। দেখে মনে হয় অনেক দিনের পুরোনো। বললো, এখানে সিগারেটের টুকরো আসবে কোত্থেকে?

তানিয়া সিগারেটের টুকরোটা নিয়ে সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। নাম পড়া যাচ্ছে না। এমনই নরম হয়েছে যে, যে কোনও মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে। বললো, প্রতিমাদি বলেছিলে পুরোনো মহলে নাকি অভিশপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। আত্মারা কি সিগারেট খায়?

প্রতিভার এত বড় আবিষ্কারের কোনও গুরুত্বই দিলো না প্রতিমা হতে পারে ঝড় বাদলের রাতে সিগারেট খোর কেউ এখানে আশ্রয় নিয়েছিলো।

তানিয়া বললো, গ্রামের কেউ জেনে শুনে এ বাড়িতে আশ্রয় নিতে আসবে বলে তোমার মনে হয়?

অন্য কোনও এলাকার হতে পারে।

প্রতিভা বললো, সিগারেটের টুকরোটা খুব বেশি হলে মাস দুয়েকের পুরোনো হবে। গত দুতিন মাসে এদিকে ঝড় বৃষ্টি হয়নি।

প্রতিমা এবার একটু চিন্তিত গলায় বললো, তোরা কি বলতে চাস এ বাড়িতে মানুষের আনাগোনা আছে?

তানিয়া বললো, অতৃপ্ত আত্মারা যদি সিগারেট না খায় তাহলে বলতেই হবে দুমাস আগেও কেউ এখানে এসেছিলো।

প্রতিমা গম্ভীর হয়ে বললো, তানিয়া, আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মা নিয়ে রসিকতা না করলে আমি খুশি হবো।

তানিয়া অপ্রস্তুত হয়ে বললো, সরি প্রতিমাদি। প্রতিভা বললো, যে বা যারা এসেছিলো তারা নিশ্চয় এ ঘরে অপেক্ষা করেছিলো।

ঠিক বলেছিস। বলে তানিয়া পাশের ঘরে গেলো। সেখানে জানালার ধারে ও তিনটে পোড়া সিগারেটের টুকরো আর একটা দেয়াশলাইয়ের খালি বাক্স দেখতে পেলো। এ ঘরের জানালা থেকেও নদী দেখা যায়।

প্রতিমা বললো, সিগারেটের টুকরো আর দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা যত্ন করে রাখতে হবে।

ওর ব্যাগের ভেতর টিস্যু পেপার ছিলো। ওদের আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলো যত্ন করে টিস্যু পৈপারে মুড়ে নিজের ব্যাগে রাখলো প্রতিমা।

দোতালা থেকে নিচে নেমে আবার ওরা নাটমন্দিরের চাতালে বসলো। প্রতিভা চিন্তিত গলায় বললো, দিদি ব্যাপারটা যতটা সহজভাবে দেখছিস আসলে তা নয়। ভূতের ভয়ে এর ত্রিসীমানায় মানুষজন আসে না বলে আমরা জানি, অথচ এখানে দিব্যি মানুষের যাতায়াত রয়েছে।

তানিয়া বললো, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি অন্য কেউ আগে থেকে সেই উদ্দেশ্যে এখানে ঘুরছে না তো?

প্রতিমা একটু ভেবে বললো, অসম্ভব কিছু নয়। আমি শুনেছি কামরূপ কামাখ্যার সাধু সন্ন্যাসীদের ভূত, প্রেত, যখ কোনও ক্ষতি করতে পারে না। অসম্ভব সাহসী হয় ওরা।

প্রতিভা ওর দিদির সঙ্গে একমত হতে পারলো না সত্যিকারের সাধু সন্ন্যাসীদের কোনও গুপ্তধনের ওপর লোভ থাকার কথা নয়। কেউ যদি ভূত প্রেত যখ বিশ্বাস না করে তারাও আসতে পারে।

তানিয়া বললো, এমনও তো হতে পারে, যারা গুপ্তধন খুঁজছে তারাই যখ আর ভূত সেজে লোকজনদের ভয় দেখাচ্ছে?

প্রতিমা বললো, তুই বলতে চাস কেউ সত্তর আশি বছর ধরে গুপ্তধন খুঁজছে?

তা কেন হবে? সিগারেটের টুকরো দেখে তো মনে হচ্ছে দুতিন মাসের ভেতরই লোকজন যাতায়াত করছে। এমনও হতে পারে সপ্তায় বা মাসে এক দিনের বেশি ওদের পক্ষে আসা সম্ভব হচ্ছে না।

তবে যে তুই বলছিস ভূত সেজে কেউ ভয় দেখাচ্ছে? লোকে ভূত দেখছে সত্তর আশি বছর আগে থেকে। আমাদের মামাতো ভাইটা যে এখানে এসে যখের পাল্লায় পড়ে মুখে রক্ত উঠে মরলো সেও তো চোদ্দ পনেরো বছর আগের কথা।

প্রতিভা বললো, এসব বিষয় নিয়ে আমরা বাড়িতে বসেও আলোচনা করতে পারবো। এখানকার কাজ নিশ্চয় এখনও শেষ হয়নি।

নিচের তলার একটা ঘরওতো দেখা হলো না!

ভরদুপুরেও মহলের নিচের তলার ঘরগুলোর ভেতরে অন্ধকার জমাট বেঁধে ছিলো। দরজা জানালার চিহ্ন না থাকলেও ফাঁকা জায়গায় ঝোঁপঝাড় গজিয়ে যাওয়ায় ভেতরের ঘরে সূর্যের আলো যেতে পারছিলো না। তানিয়া আর প্রতিভা উৎসাহ দেখালেও অন্ধকার ঘরে ঢাকার ব্যাপারে প্রতিমা মন থেকে সাড়া পাচ্ছিলো না। কে জানে অন্ধকারে কিসের ওপর পা পড়ে কিংবা কার স্পর্শ লাগে! শুকনো গলায়

ও বললো, আজ অনেক হয়েছে। হেঁটে হেঁটে আমার পা ব্যথা করছে। তাছাড়া এসব ঘরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না। টর্চ জাতীয় কিছু সঙ্গে আনা দরকার।

প্রতিমার পা ব্যথা করছে শুনে প্রতিভা বিরক্ত হয়ে বলতে যাচ্ছিলো তাহলে তুই এখানে বসে থাক, আমরা ঘুরে আসি। তবে অন্ধকারের কথাটা ওর কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। দিনের বেলা বেরুচ্ছে–টর্চ আনার কথা কারও মাথায় আসেনি।

তানিয়া বললো, কাল বরং টর্চ নিয়ে আসবো। আজ আর নিচের ঘর দেখার দরকার নেই।

হঠাৎ প্রতিভার মনে হলো পুব দিকের ধ্বংসস্তূপের ওপাশে কাঁটা ঝোঁপটার পেছনের ছোট গাছগুলো এমনভাবে নড়ছে যেন কেউ ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। দিদি ও দিকে দেখ! আঙুল তুলে চাপা গলায় প্রতিভা বললো, মনে হচ্ছে ওখানে বসে কেউ আমাদের দেখছে।

প্রতিভার কথা শেষ না হতেই সব কিছু স্থির হয়ে গেলো। এক ফোঁটা বাতাস নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। প্রতিমা বললো, বনবেড়াল নয় গুইসাপ হবে। এসব ঝোপে বড় কোনও জন্তু জানোয়ার থাকতে পারে না।

মানুষও তো হতে পারে!

এখানে মানুষ কোত্থেকে আসবে?

ঠিক তখনই দক্ষিণের ফাঁকা জায়গাটায় বনমালীর গলা শোনা গেলো–প্রতিমাদিদি, তোমরা এইখানে কী কর? আমি কখন থেইকা তোমাগো টোকাইতাছি!

প্রতিভা বিরক্ত হয়ে বললো, টোকানোর কী আছে। আমরা ছেলেমানুষ নাকি হারিয়ে যাবো? মাকে বলেছি বেড়াতে যাচ্ছি, দুটোর ভেতর ফিরবো। এখন মোটে একটা বাজে।

প্রতিমা গম্ভীর গলায় বললো, আমাদের খুঁজতে কে বলেছে তোমাকে?

ক্যান, কর্তায় কইছে। ঘোরনের এত জায়গা থাকতে তোমরা এইখানে কী কামে আইছ?

তানিয়া এরই ভেতর ঠিক করে ফেলেছে এ ধরনের প্রশ্নের কী জবাব দেবে। বললো, আমরা এক ধরনের গাছ খুঁজছি। স্কুলে পরীক্ষার জন্য দরকার হবে।

কি গাছ? আমারে কইলে তো আমিই আইন্যা দিতে পারি। তার লাইগা ভর দুপরে ভূতের ভিটায় আসনের কী কাম?

তুমি চিনবে না। ব্যানিয়ানট্রি। খুব দুর্লভ জাতের গাছ।

আমাগো বেণীমাধব কবিরাজরে কইলে হ্যায় সন্ধান দিতে পারবো। এই তল্লাটের ব্যাবাক গাছ হ্যাঁর চিনা আছে। লও দিদিরা। বাড়িত লও। ভর দুপুরে এই সব খারাপ জায়গায় আওন ঠিক না। তার উপরে তোমরা ম্যায়ামানুষ।

বনমালী যেন ওদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে–প্রতিভা উঠে দাঁড়ালো। বললো, চল দিদি। বনমালীদা ঠিকই বলছে। কাল বেণী কাকুকে জিজ্ঞেস করবো এখানে তানিয়ার ব্যানিয়ানট্রি কোথাও পাওয়া যাবে কি না। বলতে গিয়ে অতি কষ্টে হাসি চাপলো।

প্রতিমা আর তানিয়াও হাসি চেপে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো।

প্রতিমাদের হাসি চাপার ধরনটা বনামালীর ভালো লাগলো না। বাড়ির পথে যেতে যেতে অভিমান ভরা গলায় বললো, ওরা না হয় ছোট। প্রতিমাদিদি, তুমি তো জান ভূতের ভিটার ধারে কাছে জন মানুষ আসে না। একটা অঘটন ঘটলে কর্তাবাবুরে আমি মুখ দ্যাখাইতে পারুম? এইদিকে আসবা, আমারে কইলে তো পারতা।

বনমালীর বয়স চল্লিশের ওপর। তবে ওর শক্ত পেটানো স্বাস্থ্য দেখে তিরিশের বেশি মনে হয় না। তিন বছর আগে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার পর যখন বাংলাদেশের সব জায়গায় হিন্দুদের ওপর গুণ্ডারা হামলা করছিলো, টাকা পয়সা লুট করে বাড়িতে আগুন দিয়ে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন বনমালী রাতের পর রাত বন্দুক হাতে রায়বাড়ি পাহারা দিয়েছে। এক রাতে তিনটে বড় নৌকায় গুণ্ডারা এসেছিলো রায়বাড়ি লুট করার জন্য। বনমালীর গুলির বহর দেখে সবাই পালিয়েছে। তখন থেকে প্রতিমারা ওর অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছে। ওর অভিমান দেখে প্রতিমা নরম গলায় বললো, এইদিকে আসার কোনও প্ল্যান ছিলো না বনমালীদা। গাছপালা, ঝোঁপঝাড় দেখে তানিয়া বললো, এখানে খুঁজবে। দিনের বেলায় দেখে আমি আপত্তি করিনি। তুমি আবার বাবাকে বলে দিও না।

প্রতিভা বললো, আচ্ছা বনমালীদা, তুমি কীভাবে জানলে আমরা পুরোনো মহলে আছি?

কইলাম না তোমাগো টোকাইতে বাইর হইছিলাম! জিতু মাঝির পোলা নাওয়ে বইসা আছিল। আমারে কয় বনমালীদা কারে দোকাও? আমি কই প্রতিমা দিদিগো। হ্যাঁগো লগে শহরের থনে আইছে নূরু কাকার ম্যায়াও আছে। তখন পোলায় আমারে কইলো তোমাগো ভূতের টিলায় যাইতে দেখছে।

এরপর এ নিয়ে কেউ আর কথা বাড়ালো না। বাড়িতে ঢোকার সময় বনমালী শুধু মনে করিয়ে দিলো—বাইরে যাইতে হইলে প্রতিমা দিদি আমারে কইবা। প্রতিভা দিদি তোমারেও কই, দ্যাশের অবস্থা ভালো না। একটা অঘটন ঘটলে কর্তাবাবুরে আমি মুখ দ্যাখাইতে পারুম না।

প্রতিমা বললো, ঠিক আছে, এর পর থেকে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবো।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে প্রতিমার ঘরের বিশাল পালঙ্কে এসে বসলো ওরা তিন জন। প্রতিভা বললো, দিদি, তুই সব কিছুতে ঝামেলা বাঁধাস।

আমি আবার কী করলাম? অবাক হয়ে জানতে চাইলে প্রতিমা।

তুই বনমালীদাকে কেন বলতে গেলি এরপর থেকে আমরা ওকে নিয়ে বেরুবো।

নাবলবো না! ছোট বোনের পাকা পাকা কথা শুনে বিরক্ত হলো প্রতিমা–বনমালীদা যদি বাবাকে একবার বলে আমরা পুরোনো মহলে গিয়েছিলাম, বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দেবে।

বনমালীদাকে সঙ্গে নিয়েও আমরা পুরোনো মহলে যেতে পারবো না।

তানিয়ার ব্যানিয়ানট্রি খোঁজার জন্য পুরোনো মহলে গেলে বনমালী আপত্তি করবে না।

মহলের নিচের তলার অন্ধকার ঘরে বুঝি টর্চ জ্বালিয়ে লাঠি ঠুকে ব্যানিয়ানট্রি খুঁজবো?

প্রতিভার কথা শুনে তানিয়া হেসে ফেললো–প্রতিভা ঠিক বলেছে প্রতিমাদি। গাছ যত দুর্লভই হোক টর্চ জ্বালিয়ে দেয়ালে আর মেঝেতে লাঠি ঠুকে ঠুকে যে আমরা যে গাছ খুঁজছি না এটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবে না।

বনমালীদাকে না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুলেই ও হইচই বাঁধিয়ে দেবে।

তানিয়া একটু ভেবে বললো, বনমালীদাকে কোনও দরকারী কাজে কাল বাইরে কোথাও পাঠানো যায় না?

তেমন দরকারী কাজ কোথায়! চিন্তিত গলায় বললো তানিয়া। কয়েক মুহূর্ত ভেবে প্রতিভা ইউরেকা! বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

তানিয়া আর প্রতিমা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো। প্রতিভা বললো, আমার হোমওয়ার্কের খাতা ভুলে স্কুলে ফেলে এসেছি। বাবাকে বলবো কালই ওটা আমার দরকার। বনমালীদার হাতে মিসেস পেরেরাকে চিঠি লিখে পাঠালে তিনি আমার ড্রয়ার থেকে খাতা বের করে দেবেন। বনমালীদার ফিরতে ফিরতে দেড়টা দুটো বাজবে।

প্রতিমা গম্ভীর হয়ে বললো, তুই কি সত্যিই হোমওয়ার্কের খাতা হোস্টেলে ফেলে এসেছিস?

হোমওয়ার্কের খাতা কেন ফেলে আসবো? মিসেস পেরাকে লিখবো আমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল খাতা দুটো পাঠাতে।

তানিয়া মৃদু হাসলো–ভালো বুদ্ধি বের করেছিস প্রতিভা।

প্রতিমা বললো, রোজ রোজ বনমালীকে হোমওয়ার্কের খাতা আনার জন্য বাইরে পাঠানো যাবে না। যা কিছু করার কালই করতে হবে।

একদিনে কি গুপ্তধন খুঁজে পাওয়া যাবে? এত বড় বাড়ি–পুরো একমাস খুঁজলেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

প্রতিভা ঠিক বলেছে প্রতিমাদি। দেড়শ বছরের পুরোনো ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপে গুপ্তধন খোঁজা যা তা ব্যাপার নয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে বনমালী কিংবা অন্য কারও চোখ এড়িয়ে কিভাবে কাজটা করা যায়।

তানিয়ার কথার জের টেনে প্রতিভা বললো, একই সঙ্গে নজর রাখতে হবে পুরোনো মহলে কারও নিয়মিত যাতায়াত আছে কি না। আমার মনে হয় আরও কেউ গুপ্তধন খুঁজতে সেখানে যায়।

প্রতিমা বললো, এমনও হতে পারে ওরা গুপ্তধন নিয়ে কেটে পড়েছে। তোরাই তো বলছিস দেড় দুই মাসের ভেতর কেউ ও বাড়িতে যায়নি।

হতে পারে প্রতিমাদি। তবু পুরোনো জমিদার বাড়ির ধ্বংসস্তূপে গুপ্তধন খুঁজছি–ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়। সেই সঙ্গে যদি অভিশপ্ত কিংবা অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাস সেই ধ্বংসস্কৃপের ভেতর ভেসে বেড়ায় তাহলে তো ডবল রোমাঞ্চ।

প্রতিমা গম্ভীর গলায় বললো, তানিয়াকে একবার বলেছি। তোকেও শেষবারের মতো বলছি প্রতিভা। আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মাদের নিয়ে যদি ঠাট্টা ইয়ার্কি করিস ভালো হবে না। ওঁরা আমাদের নমস্য। প্রতিমা হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে পূর্বপুরুষদের আত্মাদের উদ্দেশে প্রণাম জানালো।

০৯-১০. রায়বাড়িতে শনির হুমকি

৯. রায়বাড়িতে শনির হুমকি

সকালে ঘুম থেকে উঠে তানিয়া ভেবেছিলো বাড়িতে নাশতা খেয়ে কালাকে বলবে নটার দিকে ওকে রায় বাড়িতে পৌঁছে দিতে। অবশ্য কাল রাতে আসার সময় প্রতিমা আর প্রতিভা দুজনেই বলেছে–ঘুম থেকে উঠেই চলে আসবি। জলখাবার আমাদের সঙ্গে খাবি। তানিয়ার মনে হয়েছে সকালের নাশতাটা বাবার সঙ্গে খাওয়া উচিৎ।

ঢাকার বাড়ির মতো বুয়া সকাল সাতটায় টেবিলে নাশতা দেয়। ঢাকার বাড়িতে ছিলো রুটি আর ভাজি। গ্রামে আসার পর একটা করে ডিম এর সঙ্গে যোগ হয়েছে। খামারের মুরগি ডিম দেয়া শুরু করেছে। প্রতিদিনই পাঁচ ছটা ডিমের খোসা ভেঙে যায়। ফার্মের ডিমের খোসা এমনিতেই নরম। বুয়া ভাঙা ডিমগুলো রান্নার কাজে লাগায়।

বাবার সঙ্গে তানিয়া নাশতা খেতে বসেছে–এমন সময় বনমালী হন্তদন্ত হয়ে এসে বাবাকে বললো, কর্তাবাবু আপনেরে চিঠি দিছে।

নটার ভেতর বিভূতিরঞ্জন খামারে চলে আসেন। দুপুর পর্যন্ত দুই বন্ধু খামারের তদারকি করেন। মুরগির বাচ্চা, ডিম আর মাছ বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। কালা ছাড়াও খামারে আরও দুজন লোক রাখতে হয়েছে। দিন দিন কাজ বাড়ছে। হঠাৎ বন্ধুর চিঠি পেয়ে বাবা অবাক হলেন। নাশতা অর্ধেকও শেষ হয়নি–হাত মুছে তিনি বন্ধ খাম খুলে চিঠি পড়লেন। বিভূতিরঞ্জন লিখেছেন–

ভাই নূরউদ্দিন, চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি বনমালীর সঙ্গে চলে এসো। আজ খামারে যাওয়া হবে না। কালাদের কাজ বুঝিয়ে তোমাকে হাতে সময় নিয়ে আসতে হবে। সাক্ষাতে সব বলব। ইতি বিভূতি।

বুয়া দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলো। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, কালাকে একটু আসতে বলো।

তানিয়া অবাক হয়ে জানতে চাইলো, বিভূতি কাকা চিঠিতে কী লিখেছেন।

আমাকে যেতে লিখেছেন।

হঠাৎ চিঠি? কোনও বিপদ টিপদ হয়নি তো?

জানি না। বাড়ির খবর সব ভালো তো বনমালী?

শুকনো গলায় বনমালী বললো, সকালে কর্তা বাবুর মুখ খুব গম্ভীর দ্যাখলাম। আমারে ডাইকা খালি কইছেন চিঠিটা আপনেরে দিতে।

বাবা উঠে ভেতরে গেলেন কাপড় বদলাবার জন্য। তানিয়া চাপা গলায় বললো, কী হয়েছে বনমালীদা? তুমি কিছু জানো না? কিছু শোননি?

বনমালী গম্ভীর গলায় বললো, কাইল তোমরা ভূতের ভিটায় গিয়া ভালা কর নাই।

কেন বনমালীদা?

তেনারা কুপিত হইছেন। কাইল, আমি সারা রাইত জাইগা আছিলাম। একটুও ঘুমাইতে পারি নাই। খালি রাম নাম করছি। একটু অসাবধান হইলে তেনারা আমারে গলা টিপা মারতেন। মনে হয় কর্তাবাবুও তেনাগো দেখছেন।

তানিয়ার মনে হলো বনমালী সব কথা বিভূতি কাকাকে বলে দিয়েছে। বাবাকে হয়তো এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়ার জন্য তিনি ডেকেছেন। বনমালীকে ও জিজ্ঞেস করলো, আসার সময় প্রতিমাদির সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

বাবুর লগে তোমারেও লইয়া যাইতে কইছে।

তানিয়া রহস্য করে বললো, না গেলে!

যাইবা না ক্যান! আমগো কর্তাবাবুর যদি কুন বিপদ হয় তোমরা দেখবা না?

নিশ্চয় দেখবো।

বাবা কাপড় বদলে ঘর থেকে বেরুতেই তানিয়া বললো, বাবা আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। প্রতিমাদি যেতে বলেছেন।

ঠিক আছে, তৈরি হয়ে নে। আমি কালাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে এক্ষুণি আসছি।

তানিয়ার তৈরি হতে আধঘন্টা লাগলো। ততক্ষণে কালাদের সব কাজ বুঝিয়ে বারান্দায় বসে বাবা চা খাচ্ছিলেন। তানিয়া ঘর থেকে বেরুতেই তিনি আর দেরি করলেন না। কালার মাকে শুধু বললেন, বুয়া, দুপুরে আমরা ও বাড়িতে খাবো।

তানিয়াদের বাড়ি থেকে রায়বাড়ি বেশি দূর নয়। ওদের পুকুর আর গোরস্থান পেরিয়ে খানিকটা যেতে হয় ধানক্ষেতের পাশের মাটির রাস্তা দিয়ে। তারপর কুমোরপাড়া। রতেশ্বরীর কুমোরদের মাটির কাজের প্রশংসা টাঙ্গাইল অবধি শোনা যায়। কুমোর পাড়া পেরুলে স্কুল। স্কুলের পরই শুরু হয় রায়বাড়ির আম কাঁঠাল আর লিচুর বিশাল বাগান। চারজন মালি দিন রাত বাগান পাহারা দেয়। বাগানের পশ্চিমে রায়বাড়ির সদর পুকুর। পুকুরের পরই মূল বাড়ি।

যেতে যেতে তানিয়া লক্ষ্য করলো বাবার চেহারা খুবই গম্ভীর। ও নিজেও ভেবে পাচ্ছিলো না বিভূতি কাকা বাবাকে চিঠি দিয়ে এভাবে ডাকলেন কেন। তানিয়ার একটাই ভয়–কাল ওদের পুরোনো মহলে যাওয়া নিয়ে যদি কথা ওঠে!

দূর থেকে তানিয়া দেখলো বিভূতি কাকা দোতালার ঝুল বারান্দায় পায়চারি করছেন। বাবা দোতালায় উঠলেন না। নিচের তলায় বৈঠকখানায় বসলেন। বনমালী ওপরে গেলো খবর দিতে। সেই ফাঁকে প্রতিভা এসে দরজার পাশ থেকে চাপা গলায় ডাকলো–এ্যাই তানিয়া, ওখানে বসে আছিস কেন? ওপরে আয়।

বাবাও ইশারায় তানিয়াকে যেতে বললেন। বিভূতিরঞ্জন নিশ্চয় মেয়ের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় আলোচনা করবেন না। তানিয়া বেরিয়ে যেতেই বিভূতিরঞ্জন এসে ঘরে ঢুকলেন।

সেগুন কাঠের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে প্রতিভা ওর বন্ধুকে বললো, জানিস না তো কী ভয়ঙ্কর এক বিপদের খাড়া ঝুলছে আমাদের মাথার ওপর।

কী বিপদ?

ঘরে চল বলছি। তানিয়াকে নিয়ে সোজা প্রতিমার ঘরে এলো প্রতিভা। পালঙ্কের বাজুতে হেলান দিয়ে গম্ভীর মুখে বসেছিলো প্রতিমা। তানিয়াকে দেখে বললো, ওপরে উঠে বোস! আমাদের ভীষণ বিপদ!

তানিয়া আর প্রতিভা খাটে উঠে বসলো। প্রতিমা বললো, ভোর না হতেই সাংঘাতিক এক চিঠি এসেছে।

কোত্থেকে এসেছে চিঠি? তানিয়া অবাক হয়ে জানতে চাইলো, কার চিঠি?

কোত্থেকে এসেছে জানি না। কে লিখেছে, কারা লিখেছে–কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

খামের ওপর পোস্ট অফিসের ছাপ নেই? চিঠির নিচে নাম নেই?

নামের জায়গায় লেখা আছে–শনি। চিঠি ডাকে আসেনি। ভোরবেলা মোক্ষদাদি পুজোর ফুল তুলতে বেরিয়েছিলো। এক ছেলে এসে বললো, এটা কর্তাবাবুর চিঠি। বাবু ঘুম থেকে উঠলে চিঠিটা দিও। এই বলে ছেলেটা ভোরের কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে।

চিঠিটা কোথায়?

বাবার কাছে।

তোমরা দেখেছো?

তানিয়ার প্রশ্নের জবাব দিলো প্রতিভা দেখবো না কেন? পড়তে পড়তে মুখস্ত হয়ে গেছে।

কী লেখেছে বল না?

চিঠি সবুজ রঙের খামে সবুজ কাগজে লেখা। খামের ওপরে শুধু বাবার নাম লেখা। ভেতরে লিখেছে–মালাউন বিভূতিরঞ্জন, তোমার উপর আমরা অনেক দিন ধরিয়া নজর রাখিতেছি। ভাবিয়াছিলাম তোমার জ্ঞাতি ভাইদের দ্বারা বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার অপরাধে ও লজ্জায় তুমি তোমাদের আসল দেশ হিন্দুস্থান চলিয়া যাইবা। তুমি যাও নাই। এতদিন চুপচাপ ছিলা বিধায় কিছু বলি নাই। এখন তুমি মুরতাদ নূরউদ্দিনের সঙ্গে ফার্মের ব্যবসা করিতেছ, গ্রামের মেয়েদের বেপর্দা বেহায়া বানাইবার জন্য স্কুল খুলিতেছ। এইসব কুফরি কাজের জন্য তোমাকে দশ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। দুই দিন সময় পাইবে। টাকা জোগাড় করিয়া রাখ। ভবিষ্যতের জন্য তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি।

শয়তান নূরউদ্দিনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিলে তোমার মেয়ে দুইটিকে হারাইতে হইবে। নিজেদের জীবনও খোয়া যাইবে। পুলিশে খবর দিলে জরিমানার টাকা দ্বিগুণ হইবে। পুলিশের সাধ্য নাই আমাদের গায়ে হাত দেয়। ইতি শনি।

তানিয়া জানে প্রতিভার স্মরণশক্তি খুবই প্রখর। চিঠির কথাগুলো ও এমনভাবে বললো–যেন দেখে দেখে পড়ছে। প্রতিমার কাছে জানতে চাইলো, পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে?

না। বাবা বললেন আগে নূরু কাকুর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তারপর যা করা দরকার করবেন।

.

চিঠি পড়ে তানিয়ার বাবা তার বন্ধুকে বললেন, এক্ষুণি থানায় খবর পাঠাও বিভূতি। থানায় একটা জিডি করানো দরকার। ওসি তো তোমার পরিচিত। লিখে দাও সাদা পোশাকে কিছু পুলিস পাঠাবার জন্য, যারা বাড়ির আশে পাশে নজর রাখতে পারে। অফিসার যে আসবে সেও যেন প্লেইন ড্রেস-এ আসে।

বিভূতিরঞ্জন বললেন, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না নূরউদ্দিন। যা লিখতে হয় তুমিই লেখো। আমি সই করে দেবো।

প্রতিমার মা কাগজ আর কলম এনে দিলেন। বাবা মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সম্বোধন করে একটা অভিযোগ পত্র লিখে বিভূতিরঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিলেন–পড়ে দেখ, ঠিক আছে কি না। তারপর নিচে সই করো।

বিভূতিরঞ্জন না পড়েই চিঠি সই করে দিলেন। চিঠিখানা ভাঁজ করে বাবা জানতে চাইলেন, থানায় কাকে পাঠাবো?

বনমালী থাকতে আর কে যাবে? এই বলে বিভূতিরঞ্জন গলা তুলে বনমালীকে ডাকলেন।

দুবার ডাকতেই বনমালী এসে ঘরে ঢুকলো। বিভূতিরঞ্জন বললেন, এক্ষুণি থানায় গিয়ে এ চিঠিটা দিয়ে এসো। ওসি হাকিম সাহেবের হাতে দিও।

প্রতিমার মা বললেন, আসার সময় দিদিকে বোলো, অধীরকে নিয়ে একবার যেন আসেন।

বনমালী চিঠি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বাবা জানতে চাইলেন, দিদি কি এখন মির্জাপুরে থাকেন?

দিদি মানে বিভূতিরঞ্জনের বড় বোন। বাবা জানতেন তিনি চট্টগ্রামে ছেলের কাছে থাকেন। প্রতিমার মা বললেন, অধীর করটিয়া কলেজে বদলি হয়ে এসেছে ছ মাস হলো। দুর্গা পুজার সময় দিদিকে নিয়ে ওরা সবাই বেড়াতে এসেছিলো। দিদি কালীপুজো পর্যন্ত ছিলেন।

বিভূতিরঞ্জনের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো একেবারেই ভেঙে পড়েছেন তিনি। দু বছর আগে বাবরী মসজিদ ভাঙার পর যখন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করা হলো–ভেবেছিলেন, বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রি করে দেশান্তরি হবেন। তখন নূরউদ্দিন আর তার একাত্তরের বন্ধুরা বুঝিয়েছেন–এসব গুণ্ডা বদমাশ আর স্বাধীনতার শত্রুদের জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি। এটা আমাদের দেশ। আমরা ভয় পেলে ওরা পেয়ে বসবে। দিদি তো চলে যাবেনই। জমি বিক্রি করতে গিয়ে বাঁধলো ঝামেলা। কেউ জমি কিনতে চায় না। এক লাখ টাকার জমি–বলে আট দশ হাজার হলে নিতে পারি। অধীরের শ্বশুর আরও ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। বলেছেন যেদিন জমি বিক্রির টাকা তোমাকে দেবে সেই রাতেই ওটা লুঠ হয়ে যাবে। জমি বিক্রির কথা মুখেও এনো না। অধীরের শ্বশুর তার পুরোনো বন্ধু। বন্ধুদের কথায় বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেননি, দেশও ছাড়তে পারেননি। ঠিক করেছিলেন জমানো টাকায় বাকি জীবন চলে যাবে। প্রতিমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। ছেলে আমেরিকায় থাকে, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। একদিন প্রতিভাও বিয়ে করে চলে যাবে, হয়তো বা দেশ ছেড়ে। একা কিভাবে দিন কাটাবেন এসব নিয়ে যখন ভাবছিলেন তখন শুনলেন পুরোনো বন্ধু নূরউদ্দিন গ্রামে থাকবে পাকাপাকি ভাবে। তখনই আবার নতুন করে কাজ কর্ম শুরু করার কথা ভেবেছেন তিনি। স্কুল করার ইচ্ছে তারও ছিলো। খামার করার ব্যাপারটা তাঁর খুবই ভালো লেগেছিলো। সবে মাত্র খামারের বিক্রি শুরু হয়েছে, এসময় এমন হুমকি তাঁর মন ভেঙে দিয়েছে।

তানিয়ার বাবা বললেন, তোমাকে এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না বিভূতি। দরকার হলে ইকবালদের সবাইকে খবর দেবো। আমরা কি একাত্তরে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি! সব কি ভুলে গেছি?

বিড় বিড় করে বিভূতিরঞ্জন বললেন, তোমরাই আমার ভরসা।

প্রতিমার মা বললেন, নূরুদা, আপনাকে একটু চা দেবো?

শুধু আমাকে কেন, বিভূতিকেও দিন। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে সকাল থেকে মুখে কিছু দেয়নি।

ঠিক ধরেছেন। আপনি এসেছেন, এবার যদি কিছু মুখে তোলে। এই বলে প্রতিমার মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরে প্রতিমা, তানিয়া আর প্রতিভা এসে দাঁড়ালো দরজার পাশে। প্রতিমা বললো, বাবা, আমরা কি একটু ঘুরে আসবো? তানিয়া কখনও নদীতে মাছ ধরা দেখেনি।

বিভূতিরঞ্জন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখেছো তো চিঠিতে কী লিখেছে। এখন আবার ঘুরতে যাবে–সাহস তো কম নয়!

তানিয়ার বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, বিভূতি, কোথাকার কোন গুণ্ডার উড়ো চিঠি পেয়ে তুমি মেয়েদের ঘরে আটকে রাখবে এটা তো কোনও কাজের কথা হলো না। মেয়েরা নিশ্চয় ঘুরতে যাবে। গুণ্ডারা যদি টের পায় ওদের চিঠি পেয়ে আমরা ঘাবড়ে গেছি তাহলে পেয়ে বসবে। গ্রামের লোকজন আছে না? আমাদের মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে–এতই সোজা?

তানিয়ার বাবা কথাটা মিথ্যে বলেননি। গ্রামে দু এক ঘর বাদ দিলে প্রায় সবাই রায় বাবুকে সম্মান করে। আপদে বিপদে তিনি সবার পাশে দাঁড়ান। বিশেষ করে যখন স্কুল করার কথা জানাজানি হয়েছে, যেখানে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়তে ছেলেমেয়ে কারও পয়সা লাগবে না–শুনে সবাই দারুণ খুশি। তানিয়ার বাবাকে শুধু আপত্তির কথা জানিয়েছে ওর চাচা আজিমউদ্দিন।

তানিয়ার বাবার কথা শুনে প্রতিমার বাবা কোনও কথা বললেন না। তানিয়া জানতে চাইলো–কাকা আমরা যাবো?

যাও। মৃদু গলায় বললেন বিভূতিরঞ্জন। তবে বেশি দূরে যেও না।

বেশি দুরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওদের গন্তব্য ছিলো পুরোনো মহল। বনমালী মির্জাপুর গেছে। প্রতিমারা হিসেব করে দেখেছে থানা আর পিসিমার বাড়ি ঘুরে আসতে

আসতে বিকেল হবে। সেই ফাঁকে পুরোনো মহল জরিপের কাজ সেরে ফেলা যাবে।

আগের দিনের মতো প্রতিভা গুপ্তি লাঠি সঙ্গে নিয়েছিলো। প্রতিমা নিয়েছে তিন ব্যাটারির লম্বা টর্চ। ওটা ঝোলা ব্যাগে লুকিয়ে নিতে হয়েছে। কেউ যদি বেলা এগারোটায় টর্চ হাতে ঘুরতে দেখে নির্ঘাত পাগল ভাববে।

পুরোনো মহলের ভূতের টিলায় ওঠার সময় প্রতিভা লক্ষ্য করলো আশে পাশে কেউ ওদের ওপর নজর রাখছে কি না। সন্দেহজনক কাউকে দেখা গেলো না। অনেক দূরে এদিকে পিঠ ফিরিয়ে মাঠে বসে ঘোষদের বাড়ির রতন গরু চরাচ্ছে। গাছের পাতায় মৃদু বাতাসের আনাগোনা ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। টুপ করে ওরা হারিয়ে গেলো পুরোনো টিলার ঝোঁপের আড়ালে। তানিয়াদের সঙ্গে দূরবীন ছিলো না। থাকলে দেখতে পেতো বংশী নদীর এ পারে বাঁধা ছইওয়ালা নৌকার ভেতরে বসে এক লোক চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে ওদের দেখছে।

আগের দিন অন্ধকারের জন্য পুরোনো মহলের যে ঘরে ঢুকতে পারেনি প্রতিমার টর্চের আলোয় অন্ধকার কেটে গেলো। ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ। আস্তর খসে পড়া ইট বের করা দেয়ালে জালের মতো ছড়িয়ে আছে গাছের শেকড়। ওপরে কালো কালো কী যেন ঝুলছিলো। টর্চের আলো ফেলতেই কতগুলো বাদুড় ঝটপট ডানা মেলে ঘরের ভেতর উড়তে লাগলো। প্রতিমা সাংঘাতিক ভয় পেলো। ওর মনে হচ্ছিলো কালো বাদুড় উড়ে এসে ওর ঘাড়ে বসে রক্ত শুষে খাবে। প্রতিভা আর তানিয়াও কম ভয় পায়নি। এই নিস্তব্ধ জায়গায় যে জীবিত কোনও প্রাণের চিহ্ন থাকতে পারে ওরা আশা করেনি। প্রতিভা ওর গুপ্তি লাঠি তুলে শূন্যে এলোপাতাড়ি ঘোরাতে লাগলো। কিছুক্ষণ ওড়াউড়ির পর বাদুড়গুলো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ওরা তিন জন এক সঙ্গে হাঁপ ছাড়লো। প্রতিমা চাপা গলায় বললো, কী সাংঘাতিক বাদুড় একেকটা। আরেকটু হলে আমার প্রাণ পাখি বেরিয়ে যেতো।

বিপদমুক্ত হয়ে মাটিতে টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠলো প্রতিমা–এ্যাঁ, এসব কী?

তানিয়া আর প্রতিভা তাকিয়ে দেখলো ঘরময় বহু দিনের জমে থাকা ধুলোর আস্তরণের ওপর মানুষের পায়ের ছাপ। জুতো পরা পা আর খালি পা দুটোই আছে। তানিয়া একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলো জুতোর ছাপ এক রকম নয়, দু রকম। ছাপগুলো পুরোনো নয়, মনে হয় একটু আগের। চাপা উত্তেজিত গলায় তানিয়া বললো, প্রতিমাদি, লক্ষ্য করেছো? মানুষের পায়ের ছাপ। অতৃপ্ত আত্মারা নিশ্চয় হরেক রকম জুতো পায়ে ঘোরে না। অন্ততপক্ষে তিন জন লোক এ ঘরে এসেছিলো আজ।

প্রতিমা জানতে চাইলো, আজই এসেছিলো–এটা তোর মনে হলো কেন?

সারা ঘরে খেয়াল করে দেখো, সব জায়গায় বাদুড়ের পায়খানা ছড়িয়ে রয়েছে। পায়ের ছাপে বাদুড়ের পায়খানা এখনও পড়েনি।

এ রাম! আঁতকে উঠলো প্রতিভা আমার ঘেন্না লাগছে দিদি। এক্ষুণি বাইরে চল।

ওরা বাইরে আসতেই পুব দিকের ঝোঁপগুলো অস্বাভাবিকভাবে নড়ে উঠলো। প্রতিমা ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলো, এ্যাই, কে ওখানে! বেরিয়ে এসো।

প্রতিভা আর তানিয়া ছুটে গেলো সেদিকে। কাউকে দেখতে পেলো না। বাতাসে নিঃশ্বাস টেনে তানিয়া বললো, সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি।

প্রতিভা গম্ভীর গলায় বললো, নিশ্চয় কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে। শিগগির বাড়ি চল।

.

১০. পুলিশের তৎপরতা

মির্জাপুর থেকে বনমালী ফিরলো বিকেল নাগাদ। থানার ওসি বলেছেন ওদের আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। বনমালীর সঙ্গে প্রতিমাদের পিসিমাও এসেছেন। তানিয়া দোতালার ঝুল বারান্দার ওপর থেকে সাদা থান পরা, পানের বাটা হাতে পিসিমাকে পালকি থেকে নামতে দেখলো। দূর থেকে পালকি দেখেই প্রতিমা নির্ঘাত পিসিমা, বলেই নিচে নেমে গেছে।

তানিয়াকে সঙ্গ দেয়ার জন্য প্রতিভা নিচে নামেনি। ওদের পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর পিসিমা একটু বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। দু বেলা স্নান করেন, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা সব কিছুতে বাছবিচার আর ছোঁয়াছুয়ি মেনে চলেন। তানিয়াকে ওদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে দেখলে পিসিমা কী ভাববেন এ নিয়ে প্রতিমা আর প্রতিভা দুজনই চিন্তিত ছিলো।

পিসিমা যখন এলেন তখন প্রতিমা আর তানিয়ার বাবার পাশের গ্রামে গেছেন পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে। যাওয়ার আগে বাড়ির ছাদে বন্দুক হাতে দু জন পেয়াদা পাহারা বসিয়ে দিয়ে গেছেন। মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পিসিমা ওপরে উঠে এলেন। অধীর কলেজের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত বলে আসতে পারেনি। প্রতিভা গিয়ে পিসিমাকে প্রণাম করলো। তানিয়াকে দেখে পিসিমা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, এইটা ক্যাঠা?

পিসিমার বিয়ে হয়েছিলো ঢাকায়। কথা বলেন পুরো ঢাকাইয়া টানে। প্রতিমা বললো, নূরু কাকার মেয়ে তানিয়া!

প্রতিমার মা মৃদু গলায় বললেন, নূরু ঠাকুরপো গ্রামে থাকাতে আপনার ভাই কিছু ভরসা পেয়েছে দিদি, নইলে যে কী হতো ভেবে মরি!

নুরু কি গ্যারামে থাকবার আইচে?

হ্যাঁ দিদি। বউটা মরে গেলো। চাকরিও ছেড়ে দিয়েছেন।

পিসিমাকে বসার জন্য চেয়ার এনে দিয়েছিলো মোক্ষদাদি। চেয়ারে বসে হাতের রূপোর বাটা থেকে এক খিলি পান মুখে ফেলে পিসিমা আদর করে তানিয়াকে কাছে ডাকলেন, অই ছেমরি, দূরে খাড়ায়া রইচস ক্যা? আমার বগলে আয়। দ্যাখতে তো পুরা মায়ের মতন ওইচস!

তানিয়া কাছে যেতেই পিসিমা ওর চিবুক নেড়ে আদর করে বললেন, তর বাপে আমারে দিদি কয়। তুই কী কবি?

তানিয়া মৃদু গলায় বললো, পিসিমা বলবো।

পিসিমাও কইবার পারস, ফুপুও কইবার পারস। পিসিমার কথা শুনে প্রতিমা আর প্রতিভা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

মোক্ষদাদি জিজ্ঞেস করলো, পিসিমা, আপনেরে লেম্বু দিয়া শরবত বানায়া দি?

জিগাইতাচস ক্যালা? জলদি আন। রইদের মইদ্দে আইতে গিয়া আমার চান্দি জ্বলতাচে। চেয়ারের পাশে রাখা পিকদানিতে পানের পিক ফেলে পিসিমা প্রতিমার মাকে বললেন–বনমালী কইলো শনির চিঠি পায়া বিভূতি বহুৎ পেরেশান ওইচে। চিঠিখান আমারে দ্যাখাও তো!

চিঠি নিয়ে ওঁরা বেরিয়েছেন, পাশের গ্রামের ইকবাল ঠাকুরপোর সঙ্গেও নাকি পরামর্শ করবেন।

বনমালীর কাছে হুনলাম, ইকবাইলারে লইয়া বিভূতি ছেমরিগো ইশকুল খুলতাচে?

হ্যাঁ দিদি। নূরু ঠাকুরপোও তো আছে।

বাপ ঠাকুদ্দায় ট্যাকা পয়সা যেগিনি রাইখা গেছিল এমতি উড়াইবো?

প্রতিমা বললো, পিসিমা, তুমি বোধহয় জানো না, ঠাকুরদারও ইচ্ছে ছিলো গ্রামে স্কুল করার।

কয় কি ছেমরি! আমার বাপেরে আমি জানুম না–তুই জানবি? বিভূতি পুরা বাবার খাসলত পাইচে।

মোক্ষদা শরবত আনার পর পিসিমা মুখের পান ফেলে শরবত খেয়ে সুস্থির হয়ে প্রতিমার মাকে বললেন, বউ কতা হুন। পুরানা পাইক বরকন্দাজ যেগিনি আছিলো হেগুলায় কী করতাছে?

পাইক বরকন্দাজ মানে বনমালীকে নিয়ে পাঁচজন। ছাদে আর সিং দরজায় পাহারা বসিয়েছি।

পুজার সুম দেখচি। ওই ভাতে মরাগো দিয়া কিচু ওইবো না। নূরু আর ইকবাইলাগো কও আইয়া কয় রাইত থাকতে–গ্যাছে বার রায়টের সুম যেমতে আছিলো।

নূরু ঠাকুরপোকে বলতে পারি। ইকবাল ঠাকুরপোকে বলি কিভাবে? তার এত বড় সংসার। তাছাড়া এটা তো রায়ট নয় দিদি?

রায়ট না–লাগতে কখন? তুই কইবার না পারলে আমি কমু। নাইলে ইসকুল মিসকুল কিছু করবার দিমু না। রায় শুনিয়ে পিসিমা নিজের ঘরে গেলেন। প্রতিমারা জানে রায়দের বিষয় সম্পত্তিতে ওদের বাবা আর পিসিমার সমান ভাগ। ঠাকুরদা মারা যাবার আগে সেভাবেই উইল করে গেছেন।

.

সন্ধ্যে নাগাদ তানিয়ার বাবা আর প্রতিমার বাবা বাড়ি ফিরলেন। একটু পরই চারজন সাদা পোশাকের পুলিস সঙ্গে নিয়ে থানার এক অফিসার এলো। সবাই তখন নিচের তলার বৈঠকখানায় বসে চা খাচ্ছিলো। পুলিসদের ঝুল বারান্দার নিচে দাঁড় করিয়ে জিনস পরা তরুণ অফিসার ঘরে ঢুকলো।

পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখিয়ে বললো, আমি সাব ইন্সপেক্টর সাদেক হোসেন। আপনাদের অভিযোগের তদন্ত করতে এসেছি।

তানিয়ার বাবা ওকে বসতে বললেন। প্রতিমার বাবা গম্ভীর হয়ে মেয়েদের বললেন, তোমরা ওপরে যাও।

তানিয়াদের চা খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। ওরা জানতে আগ্রহী ছিলো ইন্সপেক্টর কিভাবে তদন্ত করেন। অনিচ্ছার সঙ্গে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তানিয়া দোতালার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিলো। প্রতিভা ওর কার্ডিগানের ঝুল টেনে চাপা গলায় বললো, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? অফিসার কী করে দেখতে হবে না!

তানিয়া প্রশ্নভরা চোখে প্রতিভার দিকে তাকালো। প্রতিমাও ওর দিকে ঘাড় ফেরালো। প্রতিভা ফিস ফিস করে বললো, খাবার ঘরের দরজার খড়খড়ি খোলা আছে। ও ঘরের লাইট নিভিয়ে দিলে বসার ঘর থেকে কেউ আমাদের ওখানে দেখতে পাবে না।

তানিয়া কোনও কথা না বলে প্রতিভাকে অনুসরণ করলো। মোক্ষদাদি যাচ্ছিলো সাব ইন্সপেক্টর সাদেক হোসেনের জন্য চা আনতে। প্রতিমা চাপা গলায় ওকে বললো, আমরা খাবার ঘরে আছি। ঘরের বাতি নেভানো থাকবে। খেয়াল রেখো, কেউ যেন এদিকে না আসে।

প্রতিমাদের বাড়ির বাইরের দরজাগুলো পুরু সেগুন কাঠের। ভেতরের দরজাগুলো খড়খড়ি ওয়ালা, পুরোনো দিনের বাড়িতে যেমন থাকে। তানিয়া ওদের আনন্দময়ী স্কুলের জানালা দেখেছে এরকম খড়খড়ি ওয়ালা। জানালা বন্ধ থাকলেও শাটার্স খুলে বাইরে দেখা যায়।

ওরা যখন বসার ঘর আর খাবার ঘরের মাঝখানের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো সাদেক হোসেন তখন নিবিষ্ট মনে শনির চিঠি পড়ছিলো। তানিয়ারা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করলো–চিঠি পড়তে পড়তে সাদেকের কপালে ভাঁজ পড়েছে। অফিসারের বয়স খুব বেশি হলে চব্বিশ পঁচিশ হবে। গায়ের রঙ তামাটে, ধারালো বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ওদের মনে হলো সাদেক যদি শনিদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত এখানে থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো। অন্ততঃ ওরা দরকার মতো সাহায্য করতে পারতো।

চিঠি পড়া শেষ করে সাদেক প্রশ্ন করলো, এ চিঠি কে লিখেছে কিছু অনুমান করতে পারেন?

তানিয়ার বাবা বললেন, চিঠির ভাষা দেখে তো মন হয় এটা জামাতীদের কাজ।

আপনাদের গ্রামে জামাতের কোনও লোক আছে?

আমার বাড়িতেই আছে! তিক্ত গলায় বাবা বললেন, আমার ভাই আজিমউদ্দিনের কথাবার্তা শুনে ওকে জামাতী বলেই মনে হয়।

আরও পরিস্কার করে বলুন।

শনির চিঠিতে এটা তো স্পষ্ট হয়ে গেছে, গ্রামে মেয়েদের স্কুল করাটা ওরা পছন্দ করছে না। যুক্তি হচ্ছে মেয়েরা বেপর্দা বেহায়া হয়ে যাবে, কাজটা হচ্ছে কুফরি। আমাকে ওরা বলছে মুরতাদ। এ সবই জামাতীদের ভাষা। আজিমউদ্দিনও আমাকে বলেছে মেয়েদের স্কুল করা ঠিক হবে না। মেয়েরা বেপর্দা বেহায়া হয়ে যাবে।

সাদেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো–আজিমউদ্দিন ছাড়া এ গ্রামে জামাতের আরও কোনও লোক আছে?

মসজিদের ইমামের কথাবার্তাও ওর মতো। মাস তিনেক আগে ইমামটা ফতোয়া দিয়ে গ্রামের এক মেয়েকে একশটা জুতোর বাড়ি মেরেছে।

কেন?

মেয়েটার স্বামী মারা গেছে। মার সঙ্গে থাকে। ছোট ছোট ভাই বোন রয়েছে পাঁচটা। কাজ করে পাশের গ্রামে প্রশিকার স্কুলে। পুরুষদের সঙ্গে কেন কাজ করে এই নিয়ে ইমামের রাগ।

বিভূতিরঞ্জন বললেন, আমি শুনেছি ইমাম নাকি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। মেয়েটা রাজী না হওয়ায় এরকম ফতোয়া দিয়েছে।

তানিয়ার বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, জামাতীরা রাজনীতির ব্যাপারে সুবিধে করতে না পেরে এখন ফতোয়াবাজি করে বেড়াচ্ছে। আমি অবশ্য ইমামকে বলে দিয়েছি, আবার যদি শুনি ও কোনও ফতোয়া দিয়েছে–ধরে পুলিসে দেবো। তারপর থেকে ইমাম আমাকে আড়ালে মুরতাদ বলে।

সাদেক চিন্তিত গলায় বললো, বোঝা যাচ্ছে সাধারণ অপরাধী নয়। এদের পেছনে রাজনৈতিক দল রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে জামাতে ইসলামী এ ধরনের কাজ করবে কেন? তাদের কি টাকার অভাব আছে?

তাদের রাজনৈতিক মতলব হচ্ছে গ্রামে মেয়েদের স্কুল হওয়া বন্ধ করা। এরকম চিঠি পেলে বিভূতি যদি ভয়ে সব কিছু বিক্রি করে ইণ্ডিয়া চলে যায়–তাতেও ওদের লাভ।

আমি বলতে চাইছি অন্য কোনও দল জামাতের ভাষা ব্যবহার করে এসব করছে না তো?

আপনি বোধহয় জানেন না সাদেক সাহেব, একাত্তরে ওদের আলবদররা কাউকে ভয় দেখাবার জন্য শনি নাম দিয়ে চিঠি লিখতো। এটা ওদের পুরোনো কৌশল।

বিভূতিরঞ্জন বললেন, ওরা কোনও দল করে কিনা সেটা তো ওদের ধরলেই জানা যাবে। মাত্র দুদিন সময় দিয়েছে। এর মধ্যে ধরা কি সম্ভব হবে?

সম্ভব হতে পারে যদি ওরা আমাদের টোপ গেলে।

কিভাবে?

ওদের বোঝাতে হবে আপনারা ভয় পেয়েছেন, পুলিসে খবর দেননি। কাল টাকা জোগাড় করে বাড়িতে এনে রাখুন। পরের চিঠিতে ওরা নিশ্চয় জানাবে টাকাটা কোথায় কিভাবে দিতে হবে। আমাদের সাদা পোশাকের পুলিশ সারাক্ষণ পাহারা দেবে। ওদের চোখ এড়িয়ে টাকা নিয়ে কেউ পালাতে পারবে না।

তাহলে তো এ দুদিন আপনাকেও এখানে থাকতে হবে।

হ্যাঁ, ওসি সাহেবের সেরকমই নির্দেশ। বলেছেন ডাকাতদের গ্রেফতার করে একবারেই যেন ফিরি।

বিভূতিরঞ্জন বললেন, আপনার কথায় ভরসা পাচ্ছি সাদেক সাহেব।

সাদেক হোসেন মৃদু হেসে বললেন, আমাকে আপনারা তুমি বললেই খুশি হবো। আপনারা এই এলাকার নাম করা মুক্তিযোদ্ধা। একাত্তরে আমার জন্মও হয়নি। আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলে আমি গর্বিত হবো।

সাদেকের কথা শুনে পাশের ঘরের মেয়েরা রীতিমতো রোমাঞ্চিত হলো। প্রতিভা ফিশ ফিশ করে বললো, অফিসারটা খুব ভালো না রে দিদি! ইচ্ছে করছে ওর এ্যাসিস্টেন্ট হয়ে যাই। তোর ইচ্ছে করছে না তানিয়া?

তানিয়া মৃদু হাসলো–শোন কী বলছে!

আমি বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। ভারিক্কি গলায় বললো সাব ইন্সপেক্টর সাদেক হোসেন। চিঠিটা প্রথম কে পেয়েছিলো?

আমাদের মোক্ষদা। দাঁড়াও, ডাকছি ওকে। এই বলে বিভূতিরঞ্জন গলা তুলে ডাকলেন– বনমালী!

বনমালী ধারে কাছেই ছিলো। এক ডাকেই দরজা দিয়ে মাথা গলালো–আইজ্ঞা কর্তা!

মোক্ষদাকে একটু পাঠিয়ে দাও।

দরজার ফাঁক থেকে বনমালীর মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটু পরে লম্বা ঘোমটা। মাথায় মোক্ষদা এসে সাদেকের সামনে দাঁড়ালো। ব্র চেহারা কিংবা কাপড় চোপড় দেখলে বাইরের কেউ তাকে কাজের লোক ভাবতে পারবে না। সাদেকও ভাবলো মোক্ষদা বুঝি রায়দের কোনও আত্মীয়। বললো, চিঠিটা আপনি কিভাবে পেলেন মোক্ষদা দেবী?

মোক্ষদার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। আজ পর্যন্ত কেউ ওকে দেবী বলেনি। সাদেকের কথা শুনে ও একেবারে গলে গেলো–ঘুম থেইকা উইঠা পুজার ফুল তুলতে বাইর হইছি। এক পোলা আইসা কইলো কর্তাবাবুর চিঠি। বাবু ঘুম থেইকা উঠলে যেন দেই।

ছেলেটাকে আপনি আগে কখনও দেখেছেন?

না, এই গেরামের পোলা না।

দেখতে কেমন?

সবুজ লুঙ্গি পরা, গায়ে খদ্দরের চাদর আর মাথায় ছাই রঙের উলের টুপি আছিল। গায়ের রঙ ময়লা, তয় আমাগো বনমালীর নতন না। মুখে অল্প অল্প নতুন দাড়ি।

তানিয়ার বাবা বললেন, তুমি মাদ্রাসার ছেলেদের তো দেখেছে। ওরকম কি মনে হয়?

একটু ভেবে মোক্ষদা মাথা দোলালো–হ, মারদাসার পোলা হইবার পারে। মারদাসার পোলারা তো দাড়ি কামায় না।

ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। এই বলে সাদেক বিভূতিরঞ্জনের দিকে তাকালো–বনমালী কি সব সময় বাড়িতে থাকে?

হ্যাঁ। দরকারে মাঝে মাঝে বাইরেও পাঠাই।

কতদিন ধরে ও এ বাড়িতে আছে?

বছর তিনেক হবে!

লোক হিসেবে কি বিশ্বস্ত?

কী যে বলো। বনমালীর মতো বিশ্বাসী লোক আজকাল দেখা যায় না।

ওকে একটু ডাকুন।

একবার ডাকতেই বনমালী দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলালো–আইজ্ঞা কর্তা?

ভেতরে এসো। বললেন বিভূতিরঞ্জন।

এ বাড়িতে তুমি কতদিন ধরে আছো বনমালী? গম্ভীর গলায় জানতে চাইলো সাব ইন্সপেক্টর সাদেক হোসেন।

তিন বছর নয় মাস।

এর আগে কোথায় ছিলে?

শম্ভুগঞ্জের সরকারগো আড়তে।

ওদের কাজ ছেড়ে দিলে কেন?

ছাড়ি নাই তো! হ্যারা সব কইলকাতা চইলা গেল। আমারেও যাইতে কইছিল। আমি কইলাম মরতে হইলে বাপ ঠাকুদ্দার দ্যাশেই মরুম।

তোমাদের গ্রামের বাড়ি কোথায়?

ঢাকার বিক্রমপুরে।

গত কয়েক দিনে এ বাড়ির আশেপাশে অচেনা বা সন্দেহজনক কাউকে দেখেছো? বনমালী একটু ভেবে বললো, না হুজুর! ভালো করে ভেবে বলো। দিনে বা রাতে সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েনি?

কথাটা পুলিশকে জানানো উচিৎ হবে কিনা বনমালী একটু ভাবলো। তারপর বললো, কাইল রাইতে তেনারা আইছিলেন।

সাদেকের কপালে ভাজ পড়লো–তেনারা কারা?

বনমালী ভয়ার্ত চোখে ওর কর্তাবাবুর দিকে তাকালো। সাদেক বুঝতে পারলো না বনমালী কেন ভয় পাচ্ছে। একটু ইতস্তত করে বিভূতিরঞ্জন বললেন, তুমি এসব বিশ্বাস করবে কি না জানি না সাদেক। আমাদের এই তল্লাটের দুর্নাম আছে। আমাদের পূর্বপুরুষ খুব অত্যাচারী জমিদার ছিলো। গ্রামের বহু নিরীহ প্রজাকে ওরা অকারণে খুন করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের কয়েকজনও অপঘাতে মরেছেন। আমরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি, কেউ যদি অপঘাতে মারা যায় তার আত্মা পৃথিবী ছেড়ে যায় না। শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আত্মা আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

তানিয়ার বাবা বললেন, বিজ্ঞানের এই যুগেও তুমি এসব বিশ্বাস করো বিভূতি? আমার তো মনে হয় যারা তোমাকে চিঠি পাঠিয়েছে তারাই আত্মা সেজে ভয় দেখাচ্ছে।

চিঠি তো পেলাম আজ। এখানে অশরীরী আত্মার বিচরণ আমার জন্মেরও আগে থেকে। আমাদের পুরোনো মহলটা সে কারণেই ছাড়তে হয়েছিলো।

সাদেক বললো, হিন্দু ধর্মে কী আছে জানি না। তবে বিজ্ঞান সব রহস্যের সমাধান করেছে এটাও সত্য নয়। আজকাল ইউরোপ আমেরিকার অনেক মনোবিজ্ঞানী টেলিপ্যাথি আর স্পিরিচুয়ালিজমের ওপর কাজ করছেন। তারা বিশ্বাস করেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। মৃতের আত্মার কাছ থেকে বার্তা পাওয়া সম্ভব।

তানিয়ার বাবা মৃদু হেসে বললেন, তুমি বোধহয় রহস্য কাহিনী পড়তে ভালোবাসো। আমার মনে হয় শনির দলকে ধরতে হলে আত্মারা তোমাকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না। নিজের বুদ্ধি আর শক্তির ওপর নির্ভর করে এগুতে হবে।

বনমালী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীদের কথা শুনছিলো। পুলিস অফিসার যে আত্মার কথা অবিশ্বাস করেনি–এটা ওর ভালো লাগলো। সাদেক ওকে বললো, বনমালী, এবার তুমি যেতে পারো।

বনমালী বেরিয়ে যাওয়ার পর সাদেক বললো, যদি আপত্তি না থাকে রায়বাড়ির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমি একটু পরিচিত হতে চাই।

বিভূতিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন–তুমি বোসো, আমি সবাইকে খবর দিচ্ছি।

দোতালার কাঠের সিঁড়িতে ওঁর পায়ের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমারা খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওঁর পেছন পেছন ওরাও দোতালায় উঠে এলো। টানা বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার সময় প্রতিমা দেখলো, ওর বাবা পিসিমাকে বলছেন, দিদি তোমারে আর প্রতিমার মারে একটু নিচে আসতে হইবো। অফিসার তোমাগো লগে কথা কইবো।

মা আর পিসিমা খাটে বসে পান খেতে খেতে গল্প করছিলেন। ভাইয়ের কথা শুনে পিসিমা হাসলেন–কোইথেইকা পুইচকা ছারা একটা আইচে–হ্যায় বলে অপিচার! বৌ, ল যাই, দেইখ্যা আহি ছ্যারা কী কইবার চায়।

বিভূতিরঞ্জন বোনকে সাবধান করলেন–ওরে ছ্যারা ম্যারা কইয়া চটায়া দিও না দিদি। ডাকাইতগুলিরে না ধরা পর্যন্ত ওরে থাকতে রাজী করাইছি। তোমার কথা শুইনা চইলা গেলে আর ডাকাইত ধরা লাগবে না। এই বলে প্রতিমার মার দিকে তাকালেন মেয়েদেরও সঙ্গে এনো। আর মোক্ষদাকে বলো টেবিলে খাবার দিতে।

বাবাকে ঘর থেকে বেরুতে দেখে প্রতিমারা চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেলো। মিনিট পাঁচেক পর মা নিচে এসে বললেন, টেবিলে খাবার দেয়া হচ্ছে। খেতে খেতেই তোমাদের আলোচনা সারতে পারবে।

১১-১২. ভূতের টিলায় আলোর সংকেত

১১. ভূতের টিলায় আলোর সংকেত

প্রতিমাদের ডাইনিং টেবিল মস্ত বড় শ্বেত পাথরের, চোদ্দ জন একসঙ্গে বসতে পারে। বিভূতিরঞ্জন বসেছিলেন টেবিলের এক মাথায়। তাঁর দুপাশে তানিয়ার বাবা আর সাদেক হোসেন। সাদেকের পাশের চেয়ারে মা বসেছেন। উল্টোদিকে বসেছে প্রতিমা, তানিয়া আর প্রতিভা। পিসিমা মাছ মাংস খান না। তিনি টেবিলে না বসে তদারকি করছিলেন।

খেতে খেতে কাজের কথার চেয়ে সাদেক খাবারের প্রশংসাই বেশি করলো। কাজের কথার ভেতর প্রতিমারা কে কি করে শুধু এসব জেনে নিলো। তানিয়া আর প্রতিভা লক্ষ্য করেছে অন্য সবার চেয়ে প্রতিমার সঙ্গে কথা বলতেই সাদেকের আগ্রহ বেশি। কারণে অকারণে ও প্রতিমার দিকে তাকাচ্ছিলো। প্রতিমা ভবিষ্যতে কী করবে, দিল্লীর পড়ার স্ট্যান্ডার্ড কেমন এসবও জিজ্ঞেস করলো। এর সঙ্গে তদন্তের কী সম্পর্ক তানিয়া আর প্রতিভা খুঁজে পেলো না।

রাতে তানিয়াকে বলা হয়েছিলো ইচ্ছে করলে ও আলাদা ঘরে থাকতে পারে,ইচ্ছে করলে প্রতিভার সঙ্গেও থাকতে পারে । তানিয়া শেষেরটাই পছন্দ করেছে। যত না আত্মার ভয়ে, তার চেয়ে বেশি প্রতিভার সঙ্গে গল্প করার লোভে।

শীতের রাত, এগারোটার ভেতর যে যার ঘরে গিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। টানা বারান্দা, সিঁড়ি আর ঝুল বারান্দার লাইট সারা রাত জ্বালানো থাকে। প্রতিমার ঘর টানা বারান্দার শেষ মাথায়। ঘরের দক্ষিণে বড় বড় জানালা। জানালার বাইরে খড়খড়ির পাল্লা, ভেতরে কাঁচের পাল্লা। দরজাগুলোও তাই। প্রতিভা কাঠের দরজা বন্ধ করলেও কাঠের জানালা খোলা ছিলো। ভেতর থেকে জানালার কাঁচের পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছে। একমাত্র প্রতিভার ঘর থেকেই পুরোনো মহলের ভূতের টিলা দেখা যায়। প্রতিমার ঘরের মতো প্রতিভার পালঙ্কেও চারজন অনায়াসে শুতে পারবে। বাতি নিভিয়ে লেপের তলায় ঢুকে প্রতিভা বললো, তোর কি ঘুম পেয়েছে তানিয়া?

তানিয়া বললো, বারোটার আগে কখনও আমি ঘুমোই না। শুধু স্কুলে গিয়ে দশটায় ঘুমের অভ্যেস করতে হয়েছে।

স্কুলে দশটায় না ঘুমোলে সাড়ে চারটায় উঠবি কীভাবে।

ঘুমের ব্যাপারটা ছাড়া স্কুলটাকে খারাপ লাগছে না।

স্কুলের কথা রাখ। আমাদের তদন্তকারী অফিসারকে কেমন দেখলি?

কেমন আবার, ভালোই তো দেখতে! এত হ্যাণ্ডসাম চেহারা নিয়ে সিনেমায় না নেমে পুলিশ লাইনে কেন এলো তাই ভাবছিলাম।

দিদির ওপর ওর চোখ পড়েছে।

দিদি যা সুন্দর দেখতে, যে কোনও ছেলেই ওর দিকে না তাকিয়ে পারবে না।

শুধু তাকিয়ে দেখা নয়, সাদেক হোসেন মনে হচ্ছে দিদির প্রেমে পড়ে গেছে।

ধ্যাৎ! কী যা তা বলছিস। দিদির চেহারা দেখে বুঝেছি ওকে মোটেই পাত্তা দেয়নি।

কাল এক ফাঁকে কায়দা করে ওকে জানিয়ে দিতে হবে সামনের সামারে যে দিদির বিয়ে হবে।

কী দরকার বলার! সাদেক হোসেন স্বপ্নেও দিদিকে বিয়ে করার কথা ভাববে না।

হঠাৎ প্রতিভা চমকে উঠলো। বাইরের জানালার দিকে মুখ করে শুয়েছিলো ও। তানিয়া শুয়েছে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে। উত্তেজিত গলায় প্রতিভা বললো, তানিয়া, পুরোনো মহলের দিকে তাকিয়ে দেখ!

তানিয়া পাশ ফিরে জানালার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জানতে চাইলো–কী দেখবো?

হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখলাম।

বলিস কী? পুরোনো মহলে আলো আসবে কোত্থেকে?

আকাশে চাঁদ না থাকলেও তারার আলোতে তরল অন্ধকারের ভেতর পুরোনো মহলের ভূতের টিলা আর চারপাশের গাছপালার গায়ে অন্ধকার জমাট বেঁধে ছিলো।

একটু পরে তানিয়াও দেখলো এক ঝলক আলো ফোয়ারার মতো ওপর দিকে উঠে আবার নিভে গেলো। প্রতিভা আগের মতো উত্তেজিত গলায় বললো, দেখলি?

তানিয়ার বুকের ভেতরও উত্তেজনা চিব ঢিব করছিলো। বললো, মনে হচ্ছে টর্চের আলো। কেউ কাউকে সংকেত পাঠাচ্ছে।

প্রতিভা আর তানিয়া বিছানার ওপর উঠে বসলো। প্রতিভা বললো, দিদিকে ডেকে দেখাই। ওর তো ধারণা পুরোনো মহলে অভিশপ্ত আত্মারা কিলবিল করছে।

প্রতিভা পালঙ্ক থেকে নেমে চেয়ারের ওপর রাখা আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিলো। তানিয়াও ওর কার্ডিগানটা পরে নিলো। বাইরে কনকনে শীত।

খুব সাবধানে দরজা খুললো প্রতিভা। চাপা গলায় বললো, একেবারে দেয়াল ঘেঁষে হাঁটবি। নইলে বারান্দার আলোয় আমাদের দেখে ফেলবে।

প্রতিভার পাশের ঘরটা পিসিমার। তারপর প্রতিমার ঘর। ওরা ভেবেছিলো প্রতিমা বোধহয় ওদের মতো দরজায় ছিটকিনি তুলে বন্ধ করে দিয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলো দরজা এমনি ভেজানো, ছিটকিনি

লাগায়নি। আস্তে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো। তাকিয়ে দেখলো টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে প্রতিমা বই পড়ছে।

দরজা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকলো। প্রতিমা পেছন ফিরে এদের দুজনকে দেখে অবাক হয়ে গেলো–কী রে, তোরা এখনও ঘুমোসনি?

প্রতিমার কাছে গিয়ে প্রতিভা আগে দেখলো ও কী বই পড়ছে। টেবিলের ওপর উপুড় করে রাখা বইটা বারবারা কার্টল্যাণ্ডের লাভ আণ্ডার ফায়ার। ও ভেবেছিলো বুঝি ভূতের গল্প পড়ছে প্রতিমা। বললো, শিগগির আমার ঘরে চল দিদি। পুরোনো মহলে এক সাংঘাতিক জিনিস দেখাবো।

প্রতিমা ঘাবড়ে গিয়ে বললো, মাঝ রাতে পুরোনো মহলে সাংঘাতিক কী দেখলি?

চল না! নিজের চোখেই দেখবি।

প্রতিমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। সত্যিই কি কোনও অতৃপ্ত আত্মা সংকেত পাঠাচ্ছে? অনেক সময় এসব আত্মারা উপযুক্ত মাধ্যমের জন্য অপেক্ষা করে। মাধ্যম হওয়ার মতো কাউকে পেলে তার ওপর ভর করে নিজেদের প্রতিহিংসা মেটায়। প্রতিভা আর

তানিয়াকে এ নিয়ে কিছু বলে লাভ নেই। ওরা নিজের চোখেই দেখুক আত্মা বলে কিছু আছে। কিনা।

কোনও রকম শব্দ না করে তিনজন দক্ষিণের জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও বাইরের তরল, গাঢ়, স্থির অন্ধকারে কিছু দেখা গেলো না। প্রতিমা চাপা গলায় জানতে চাইলো–কী দেখাতে চেয়েছিলি বল না প্রতিভা?

প্রতিমাকে আর সাসপেন্সে রাখা ঠিক হবে না ভেবে প্রতিভা যেই বলতে যাবে ভূতের টিলার আলোর সংকেতের কথা তখনই ঘন গাছপালার ভেতর এক ঝলক আলো ফোয়ারার মতো আকাশের দিকে উঠে এলো। আগের মতো একবার নয়, থেমে থেমে তিনবার আলোর ঝলক দেখলো ওরা। প্রতিভা উত্তেজিত গলায় বললো, দেখলি?

তানিয়া বললো, খুব জোরালো টর্চের আলো মনে হচ্ছে। কোথাও সংকেত পাঠাচ্ছে।

শুকনো গলায় প্রতিমা বললো, সংকেত ঠিকই পাঠাচ্ছে। তবে টর্চের আলো ওরকম নয়।

টর্চের আলো তাহলে কী রকম? জানতে চাইলো তানিয়া।

টর্চের আলো কখনও পাইপের মতো সরু করে ফেলা যায় না। ওপর দিকে টর্চের আলো ফেললে ওটা ছড়িয়ে পড়বে। তাছাড়া আলোটা আমার মনে হলো একটু নীলচে আর সবজেটে। সায়েন্স ফিকশন সিনেমায় দেখা অনেকটা লেযার বীম-এর মতো।

প্রতিমার বলার পর প্রতিভা আর তানিয়ারও মনে হলো টর্চের আলো এরকম হতে পারে না। অবাক হয়ে প্রতিভা বললো, পুরোনো মহলে লেযার এলো কোত্থেকে?

কাষ্ঠ হেসে প্রতিমা বললো, লের বীম-এর মতো বলেছি। ওখানে লেযার আসার প্রশ্নই আসে না। ওখানে কেন, বাংলাদেশে কারও কাছে লেয়ার লাইট আছে বলে তো শুনিনি।

তবে ওটা কিসের আলো?

তোরা তো আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলি। আমার মনে হচ্ছে কোনও অতৃপ্ত আত্মা কোনও সংকেত পাঠাতে চাইছে।

কাদের সংকেত পাঠাচ্ছে?

হয়তো আমাদের। ওরা কিছু বলতে চাইছে।

আনন্দময়ী স্কুলে থাকতে তানিয়া ই-টি ছবিটা দেখেছিলো। গ্রহান্তরের অদ্ভুত প্রাণীগুলোর জন্য ওর ভারি কষ্ট হয়েছিলো। বললো, প্রতিমাদি, অন্য গ্রহ থেকে কেউ আসেনি তো?

প্রতিভা ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিলো–কী যে বলিস তানিয়া! দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে অন্য গ্রহের মানুষ বুঝি আমাদের রত্নেশ্বরীর ভাঙা মহলে আস্তানা গাড়বে!

তাহলে বল লেযার রে কোত্থেকে আসবে? তুই তো আবার আত্মা বিশ্বাস করিস না?

কাল গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী।

আজও তো গিয়েছিলাম। পায়ের ছাপ ছাড়া তো কিছু দেখিনি।

কাল হয়তো দেখবি তিন আঙ্গুলওয়ালা গোল গোল পায়ের ছাপ। যদি সত্যিই অন্য গ্রহের কেউ আসে!

প্রতিমা বললো, আজ রাতটা জাগলে কেমন হয় রে প্রতিভা। দেখি না কী সংকেত পাঠায়।

ঠিক বলেছিস দিদি। আত্মা হোক কিংবা গ্রহান্তরের মানুষ কী বলতে চায় দেখা দরকার।

তাহলে চল খাবার ঘর থেকে গরম জলের ফ্লাস্ক আর কফির কৌটোটা নিয়ে আসি। কফি না খেলে আমি রাত জাগতে পারবো না।

প্রতিমার প্রস্তাব প্রতিভা আর তানিয়া দুজনই লুফে নিলো। মা বাবা পিসিমা কেউ যাতে টের না পায় সেদিকে খেয়াল রেখে পা টিপে টিপে ওরা নিচের খাবার ঘরে এলো।

রাতে যদি কারও দরকার হয় এই ভেবে রোজ ঘুমোতে যাবার আগে মোক্ষদা খাবার টেবিলে এক ফ্লাস্ক গরম জল রেখে যায়। এতদিন কারও দরকার হয়নি। প্রতিভা চাপা গলায় বললো, আজ মোক্ষদাদির গরম জলের সদ্ব্যবহার হবে।

শুধু গরম জলের ফ্লাস্ক নয়, একটা কাপড়ের ব্যাগে প্রতিমা তিনটা কাপ, চামচ, কফি কৌটো, চিনির বয়েম, আর বিস্কুটের টিন–সব গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে যাবে–প্রতিভা চাপা গলায় বললো, দিদি, আমাদের হ্যাণ্ডসাম অফিসারটা ঘুমোলো কিনা দেখে আসি।

ঘুমোবে না তো মাঝরাতে কী করবে?

তোর মতো যদি কোনও প্রেমের উপন্যাস পড়ে?

দেবো এক থাপ্পড়! জেগে থাকলে দ্রলোক কী ভাববেন বলতো। নানা প্রতিভা, শেষে এক কেলেঙ্কারি হবে।

কেলেঙ্কারি কেন হবে? আমরা তিনজন আছি না! জেগে থাকলে জিজ্ঞেস করবো কফি খাবেন কি না।

তানিয়া বললো, ওঁর কাছে পিস্তল আছে। পুরোনো মহলের আলোর সংকেত আমরা ওঁকেও দেখাতে পারি। শনির চিঠির সঙ্গে এই আলোর কোনও সম্পর্ক আছে কি না এটা দেখা তো ওঁর কর্তব্য।

তানিয়ার যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারলো না প্রতিমা। বললো, ঠিক আছে চল! দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকলে তুলতে পারবি না। দরজা ধাক্কানোর শব্দ হলেই নূরু কাকা জেগে যাবেন।

তানিয়ার বাবার পাশের ঘরেই সাদেক হোসেনকে থাকতে দেয়া হয়েছে। ওর সঙ্গে যেসব পুলিস এসেছে ওরা থাকবে বাইরে বনমালীদের পাশের ঘরে। পেয়াদা বরকন্দাজদের জন্য টানা ব্যারাকের মতো আটটা ঘর বানানো হয়েছিলো। আগে আটটাতেই লোক থাকতো। এখন তিনটা ঘর খালি পড়ে থাকে।

দোতালার মতো নিচের তলার টানা বারান্দার লাইট সারা রাত জ্বালানোর কথা থাকলেও ওরা দেখলো লাইট জ্বালানো হয়নি। প্রতিমা সুইচে হাত দিয়ে দেখলো ওটা অন করা, বিরক্ত হয়ে বললো, বারান্দার লাইট নষ্ট হয়ে গেছে কারও খেয়ালই নেই।

সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং আর ঝুল বারান্দার লাইটের আলোয় অবশ্য টানা বারান্দার অন্ধকার অনেকখানি কেটে গেছে। তানিয়ার বাবা যেন টের না পান–সাবধানে পা ফেলে ওরা সাদেক হোসেনের ঘরের সামনে এলো।

প্রথমে মনে হয়েছিলো দরজা বন্ধ, টোকা দিতে গিয়ে প্রতিভা ইতস্তত করলো। সাবধানে খড়খড়ি ফাঁক করে দেখতে চাইলো ভেততে, আলো আছে কিনা, তখনই ও টের পেলো দরজা ভেতর থেকে আটকানো হয়নি, তবে ঘর অন্ধকার। সামান্য টানতেই কাঠের দরজা খুলে গেলো।

ভেতরে ঢুকে বাঁ হাতে সুইচ বোর্ডে হাতে রেখে প্রতিভা প্রথমে লাইট জ্বালালো। মস্ত খাটের ওপর আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলো সাদেক হোসেন। তার মানে ঘুম থেকে উঠিয়ে তাকে পুরোনো মহলের ঘটনাটা বলতে হবে।

পায়ে পায়ে খাটের কাছে এগিয়ে গেলো প্রতিভা। ওর পেছনে ব্যাগ কাঁধে প্রতিমা আর তানিয়া। তানিয়া ঘরে ঢুকে দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিভা চাপা গলায় ডাকলো, সাদেক ভাই!

কোনও সাড়া শব্দ নেই। গলা এক ধাপ তুলে ও আবার ডাকলো, সাদেক ভাই!

এবারও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। সাদেকের কম্বল ঢাকা মাথায় হাত দিয়ে ঠেলতে গিয়ে চমকে উঠলো প্রতিভা। কম্বল সরিয়ে দেখে ভেতরে পাশ বালিশ আর মাথার বালিশটা মানুষের মতো শুইয়ে রাখা। সাদেক নেই।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওরা তিনজন একে অপরের দিকে তাকালো। তানিয়া চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, কোথায় গেলেন সাদেক ভাই?

প্রতিমা বললো, যেখানেই যান, তিনি চান না তার যাওয়ার কথা কেউ জানুক।

প্রতিভা বললো, আমার মনে হয় পুরোনো বাড়িতে তিনিও আলোর সংকেত দেখতে পেয়েছেন। হয়তো সেখানে গেছেন।

টেবিলের ওপর পানির গ্লাস আর ঢাকা দেয়া জগ। আলনায় সাদেকের একটা প্যান্ট আর তোয়ালে ঝুলছে।

খাটের তলায় ওর এয়ার ব্যাগটা। অনুচিত জেনেও প্রতিমা এগিয়ে গিয়ে ব্যাগের চেইন খুলে ভেতরে হাতড়ে দেখলো। বাড়তি দুটো শার্ট, একটা প্যান্ট, শেভ করার জিনিসপত্র আর সাদেকের পিস্তল ছাড়া ব্যাগে আর কিছু নেই। চেইন বন্ধ করে বললো, আমরা এ ঘরে এসেছি এটা জানতে দেয়া উচিৎ হবে না।

প্রতিভা বালিশগুলো ঠিক করে আগের মতো কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো। তানিয়া বললো, সাদেক ভাই যদি একা পুরোনো মহলে গিয়ে থাকেন ওঁর কোনও বিপদও হতে পারে। আমার মনে হয় বাবাকে জানানো দরকার।

প্রতিমা মাথা নেড়ে সায় জানালো। ও জানে ওর বাবাকে বললে তিনিও এ কাজই করতেন। লাইট নিভিয়ে দরজাটা আগের মতো বন্ধ করে ওরা পাশের ঘরের দরজায় টোকা দিলো।

এ ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা। তানিয়া খড়খড়ি তুলে চাপা গলায় ডাকলো, বাবা, দরজা খোল।

তানিয়া জানে ওর বাবার ঘুম খুবই পাতলা। সামান্য শব্দ হলেই জেগে যান। দুবার ডাকতে হলো না। তার আগেই লাইট জ্বালিয়ে দরজা খুলে ওদের তিনজনকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন বাবা–এত রাতে তোরা কী করছিস?

ভেতরে ঢুকে তানিয়া পুরোনো মহলে আলো দেখা থেকে শুরু করে সাদেক হোসেনের অন্তর্ধান পর্যন্ত সব খুলে বললো। ওর কথা শুনতে শুনতে বাবার কপালে ভাঁজ পড়লো। চিন্তিত গলায় তিনি বললেন, আমার মনে হয় সাদেক বুঝতে পেরেছে বাড়ির ভেতরই শনির কোনও লোক আছে। ও চায় না রাতে ও যে বাইরে যাচ্ছে বাড়ির কেউ জানুক। তোরা শুয়ে পড়। যা করার আমি করবো। তোরা কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলবি না রাতে কী দেখেছিস।

ওরা তিন জন পা টিপে টিপে দোতালায় প্রতিভার ঘরে এলো। দক্ষিণের জানালার সামনে চাদর পেতে বসে কফি আর বিস্কুট খেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। আলোর সংকেত না দেখলেও ঠিক তিনটার সময় ঝুল বারান্দার আবছা আলোয় সিং দরজার কাছে মুহূর্তের জন্য দুটো ছায়ামূর্তি দেখলো ওরা। এর কিছুক্ষণ পর শুধু সাদেককে দেখলো এদিক ওদিক তাকিয়ে সাবধানে বাড়িতে ঢুকতে।

.

সকালে নাশতার টেবিলে রাতের মতো সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছিলো। আজকাল প্রতিমাদের টেবিলে খাবারের বহর দেখে তানিয়া চমকায় না। তবে সাদেক নতুন বলেই প্রতিমার মা যখন ওর প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছিলেন আঁতকে উঠলো–এত কে খাবে?

টেবিলে লুচি, আলুর দম, ডিম ভাজা, মোহনভোগ আর ঘরে বানানো ছানার সন্দেশ তো ছিলোই, তার ওপর ছিলো বড় পাথরের বাটি ভর্তি পাকা পেঁপে, কলা, আপেল আর আঙুরের কাস্টার্ড।

প্রতিমার মা বললেন, সারা দিন ছুটোছুটির কাজ করবে, ভালো করে এ বেলা খেয়ে নাও।

তানিয়ার বাবা খেতে খেতে সাদেককে জিজ্ঞেস করলেন, রাতে তোমার ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?

মৃদু হেসে সাদেক বললো, এক ঘুমেই রাত কাবার করে দিয়েছি।

তাও ভালল! বিভূতিদের আত্মারা তোমার জানালার পাশে উৎপাত করেনি।

সাদেক একটু গম্ভীর হয়ে বললো, পুলিশের চাকরি করলেও আমি আল্লাহ খোদা মানি। কোরান শরীফে যে জ্বীনের কথা আছে এটা কি আপনি অস্বীকার করতে চান?

কোরান শরীফ যারা পড়েছে তারা সবাই এটা জানে।

তবে বিজয়ীর ভঙ্গিতে সাদেক বললো, জ্বীনদের ভেতর ভালো যেমন আছে, খারাপও আছে। খারাপ জ্বীন সব সময় মানুষের ক্ষতি করতে চায়।

জ্বীন দেখতে কেমন সাদেক ভাই? নিরীহ গলায় জানতে চাইলো তানিয়া।

জ্বীনদের মানুষ এমনিতে দেখতে পায় না যদি না ওরা দেখা দেয়। ভালো জ্বীন মানুষের চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। খারাপ জ্বীন সাপের চেহারা নিয়ে পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতে থাকে। জন্তু জানোয়ারেরও চেহারা ধরতে পারে তারা।

আপনি কখনও জ্বীন দেখেছেন? প্রশ্ন করলে প্রতিভা।

আমার দাদা ছিলেন নাম করা কামেল পীর। তাঁর দুটো পোষা জ্বীন ছিলো। ওরা দাদার কাছে কোরান শরীফ শেখার জন্য এসেছিলো। ছোটবেলায় ওদের দেখেছি। অসময়ে আমাদের জন্য আঙুর, আপেল এনে দিতো।

আঙুর আপেলের আবার অসময় কী, সারা বছরই তো পাওয়া যায়।

বড় শহরে পাওয়া যেতে পারে। গ্রামে পাওয়া যায় না।

প্রতিমার বাবা প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, সাদেক, আজ কী করবে ঠিক করেছো?

আমি রত্নেশ্বরী গ্রামটা ঘুরে দেখতে চাই। আপনি টাকা জোগাড় করে রাখুন। আমার ধারণা আজ রাতের ভেতর ওরা জানাবে টাকা কোথায় কিভাবে দিতে হবে। বাড়ির লোকজন সবাইকে জানিয়ে দিন, অচেনা কোনও লোক চিঠি দিতে বা কিছু বলতে এলে ওকে যেন আটকে রাখে।

আটকে রাখলে শনির দল আমাদের ফাঁদে পা দেবে কেন?

আটকে রাখবো চিঠির উত্তর দেয়ার জন্য। আমরা বলবো টাকা একবারে জোগাড় করা যায়নি। এখন পাঁচ পেয়েছি, বাকি পাঁচ দু দিন পরে দেবো। আমার মনে হচ্ছে এর পেছনে বড় মাথাওয়ালা কেউ রয়েছে। সে কে জানার জন্য একটু সময় দরকার।

তানিয়ার বাবা বললেন, ভালো বুদ্ধি বের করেছে। বিভূতি, টাকা আনতে কখন যাবে?

শুকনো গলায় বিভূতিরঞ্জন বললেন, দশ লাখ টাকা ঘরেই আছে।

বলেন কী? চমকে উঠলো সাদেক–এত টাকা বাড়িতে আছে জানলে ডাকাত পড়বে যে! নগদ টাকা ব্যাংকে রাখলেই তো পারেন।

পারি। তবে তুমি বোধহয় জানো না, সরকার এখন নিয়ম করেছে হিন্দুরা ইচ্ছে করলে ব্যাংক থেকে ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা তুলতে পারবে না।

সাদেক অবাক হলো–এমন কথা তো শুনিনি?

ব্যাংকে পরিচিত লোক থাকলেই জানতে পারবে। দু বছর ধরে এরকম নিয়ম হয়েছে। শুধু তাই নয়, হিন্দুদের ব্যাংক লোন দেয়াও এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে।

সাদেক আর কোনও কথা বললো না। একটু পরে তানিয়ার বাবা বললেন, সাদেক যখন এসে পড়েছে আমি বরং আজ ঢাকা থেকে ঘুরে আসি। স্কুলের ব্যাপার নিয়ে ইকবাল বলছিলো কোন এনজিওর সঙ্গে নাকি কথা বলবে।

বিভূতিরঞ্জন জানতে চাইলেন, সন্ধ্যের আগে ফিরছো তো?

সব্যের আগেই ফিরবো। যদি বলো রাতে ইকবালকেও এখানে থাকতে বলতে পারি।

বিভূতিরঞ্জন সাদেককে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বলো! ইকবাল আমাদের পুরোনো বন্ধু, পাশের গায়ে থাকে।

সাদেক গম্ভীর গলায় বললো, আমি শনির দলকে কোনও ভাবেই ঘাবড়ে দিতে চাই না। বাড়িতে বেশি লোকজন দেখলে ওরা নাও আসতে পারে।

সেক্ষেত্রে আমরাও তো বাড়ি ফিরে যেতে পারি। বললেন তানিয়ার বাবা।

সাদেক মাথা নাড়লো–যারা রায় সাহেবকে হুমকি দিয়েছে তারা ভালো করেই জানে ওঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী। আপনি থাকবেন এটা ওদের হিসেবে আছে।

ছয় পদ নাশতার পর আয়েশ করে চা খেয়ে তানিয়ার বাবা আর দেরি করলেন না। বিদায় নিয়ে ঢাকার পথে রওনা হয়ে গেলেন। সাদেক বললো, এক হিসেবে ভালোই হলো। শনির দল ভাববে উনি টাকা আনতে শহরে গেছে।

বল কী! চমকে উঠলেন বিভূতিরঞ্জন–তাহলে তো ফেরার সময় ওরা টাকার জন্য ওর ওপর হামলা করতে পারে।

করবে না! দেখলেই বুঝবে ওঁর কাছে যে টাকা নেই। দশ লাখ টাকা আনতে হলে বড় ব্রিফকেস নয় ব্যাগ দরকার। এত টাকা পকেটে করে আনা সম্ভব নয়।

সাদেক, ধরো ওরা যদি রাতে বড় দল নিয়ে হামলা করে, তোমার ওই পুলিশ কটা সামলাতে পারবে?

নাশতা শেষ হওয়ার পর উল বুনতে বুনতে পিসিমাও যোগ দিয়েছিলেন ড্রইংরুমের বৈঠকে। বললেন, তরে পুজার সুম কইচিলাম, বিভূতি জোয়ান দেইখা চাইরটা পেয়াদা রাখ। একা বনমালী কয় দিক সামাল দিবো? বাকিগুলান তো ঘাটের মড়া, অগরে দিয়া ডাকাইত ঠ্যাকাপি কেমতে। খালি তো গাঞ্জা খায়া ঝিম মাইরা বয়া থাকে।

বিভূতিরঞ্জন বললো, ওরা বাবার আমলের পেয়াদা। ওদের তাড়াই কী করে?

আমি অগো খ্যাদানের কতা কই নাইক্যা। কইতাচি বনমালীর মতন জোয়ান দেইখ্যা আরও চাইরটা পেয়াদা রাখ।

সাদেক গম্ভীর হয়ে বললো, আমার মনে হয় না শনির দল বাড়িতে হামলা করার মতো বোকামি করবে। বাড়িতে ঢুকতে হলে ওদের অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আসতে হবে। ছাদে আর সিং দরজায় আমার ফোর্স রয়েছে। হামলা করতে এলে পাখির মতো মারা পড়বে। আজ রাতে আমি নিজেও পাহারা দেবো।

বিভূতিরঞ্জন হাঁপ ছেড়ে বললেন, তোমার কথা শুনে ভরসা পেলাম।

তানিয়া আদুরে গলায় বললো, সাদেক ভাই, আমরা কি নদীর তীরে বেড়াতে যেতে পারি?

একটু ভেবে সাদেক বললো, যেতে পারো, তবে বেশি দূরে যেও না।

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, যেখানেই যাও, সঙ্গে বনমালীকে নিয়ে যাবে।

সাদেক বললো, বনমালীকে আমি সঙ্গে নিতে চাচ্ছি। গ্রামের লোকজনদের সম্পর্কে ও ভালো বলতে পারবে। দিনের বেলা এদের কিছু করা শনির দলের সাহস হবে না।

ওপরে গিয়ে তৈরি হতে হতে তানিয়াদের ঝাড়া এক ঘন্টা লাগলো। আগের দিনের মতো কাপড়ের ঝোলা ব্যাগে টর্চ আর পানির বোতল নিতে ভুললো না প্রতিমা। প্রতিভা যথারীতি গুপ্তি লাঠি সঙ্গে নিয়েছে। নিচে নেমে শুনলো পিসিমা মাকে বলছেন, শনির ফাড়াকাটলে আমি কূপিত আত্মাগো মুক্তির লাইগা যজ্ঞ কইরা তারপর যামু কইলাম। এই বলে তিনি অদৃশ্য আত্মাদের উদ্দেশ্যে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

প্রতিভা নিচু গলায় তানিয়াকে বললো, পিসিমার যজ্ঞের আগেই আমরা আত্মাদের পিণ্ডি চটকাবো।

প্রতিমা গম্ভীর হয়ে বললো, গুরুজনদের নিয়ে হাসাহাসি করার বাজে অভ্যাস এখনও তোর গেলো না!

হাসতে হাসতে প্রতিভা বললো, পিসিমা যদি জানতেন আত্মারা পুরোনো মহলে জুতো পায়ে দিয়ে ঘোরেন তবেই ওঁর ভক্তি শ্রদ্ধা কর্পূরের মতো উবে যেতো।

প্রতিমা কথা না বাড়িয়ে হাঁটার গতি বাড়ালো। দুপুরে খাওয়ার আগে বাড়ি ফিরতে হবে। তানিয়া নিচু গলায় প্রতিভাকে বললো, আমার মনে হচ্ছে পুরোনো মহলে আজ সাদেক ভাইর জুতোর ছাপ দেখতে পাবো।

কী করে বুঝবি ওটা ওর জুতোর ছাপ?

ড্রইংরুমে গল্প করার সময় আমি সবার পায়ের জুতোর তলা লক্ষ্য করে দেখেছি। সাদেক ভাইয়ের পায়ে ছিলো মোটা খাঁজকাটা তলার নর্থ স্টার কেডস।

রাতে যদি সাদেক ভাই পুরোনো মহলে গিয়ে থাকেন–লুকোচ্ছেন কেন?

তদন্তের ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে। তার তো ধারণা আমাদের বাড়িতেই শনির গুপ্তচর রয়েছে।

কে, বনমালীদা!

বনমালীদা কখনও এরকম কাজ করবে না। পুরোনো পেয়াদাদের কেউ হতে পারে। টাকার লোভে হয়তো শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

কী বিপদ! বাড়িতে এসব লোক নিয়ে থাকিস কী করে? কখন কী অঘটন ঘটে বলা যায়?

শনির দলকে ধরতে পারলেই জানা যাবে বাড়িতে ওদের কোনও চর আছে কি না।

পুরোনো মহলের অন্ধকার ঘরে আগের দিন যেখানে পায়ের ছাপ দেখেছিলো আগে ওরা সেখানে গেলো। নতুন পায়ের ছাপ সেখানে ছিলো। টর্চের আলোয় পায়ের ছাপ দেখে তানিয়া চমকে উঠলো। না, সাদেকের নর্থ স্টার কেডস্-এর ছাপ এরকম নয়। আগের দিনের পুরোনো পায়ের ছাপে ময়লা পড়েছে, নতুন ছাপে কোনও ময়লা নেই। প্রতিভা বললো, তানিয়া, এগুলো তো নতুন মনে হচ্ছে। তুই ঠিকই বলেছিলি। সাদেক ভাই কাল রাতে এখানে এসেছিলেন।

তানিয়া শুকনো গলায় বললো, না, এগুলো সাদেক ভাইর জুতোর ছাপ নয়।

তাহলে কার জুতো?

সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।

তার মানে কাল যারা এখান থেকে আলোর সংকেত পাঠিয়েছে তাদের কারও জুতোর ছাপ এটা।

প্রতিমা চিন্তিত গলায় বললো, এ ঘরে কিছু একটা আছে। নইলে এখানে এত পায়ের ছাপ কেন?

তানিয়া বললো, এখানে ধুলো বেশি বলে পায়ের ছাপ আমাদের চোখে পড়ছে।

প্রতিভা লাঠি ঠুকে ঠুকে বললো, তবু এ জায়গাটা আমাদের ভালো ভাবে দেখা দরকার।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে প্রতিভা পাশের ঘরে গেলো। চারপাশে টর্চের আলো ফেলে প্রতিমা দেখলো এ ঘরে ধুলো ময়লা কম। সিলিঙে অসভ্য বাদুড়গুলোও নেই। তানিয়া বললো, এ ঘরটা মনে হয় কেউ ব্যবহার করেছে।

নোনা ধরা দেয়ালের ভ্যাপসা গন্ধ ছাড়াও অন্য রকম একটা গন্ধ ছিলো। কেমন যেন নেশা ধরানো গন্ধ, কোত্থেকে আসছে ওরা বুঝতে পারলো না।

ভেতরের দিকে আর একটা ঘর মোটামুটি অক্ষত ছিলো। সে ঘরে যাওয়ার দরজার জায়গাটা বেশ ছোট, যদিও দরজার পাল্লা চৌকাঠ কিছুরই অস্তিত্ব ছিলো না। টর্চ হাতে প্রতিমা আগে ঢুকলো। ওর চেয়ে সামান্য লম্বা হলেই মাথা নিচু করে ঢুকতে হবে।

টর্চের আলোয় ওরা দেখলো, ঘরের আয়তন আরও ছোট, একপাশে এক মানুষ সমান উঁচু একটা বেদির মতো। দ্বিতীয় ঘরের মতো এ ঘরটাও বেশ পরিষ্কার, তবে বাইরে থেকে এক রত্তি আলো ঢোকার উপায় নেই। যেখান দিয়ে ওরা ঢুকেছে আগে ওটাই ছিলো একমাত্র দরজা। কোনও জানালা বা ভেন্টিলেটার নেই।

ঘরের ভেতর বেমানান দেখতে বেদিটার ওপর আলো ফেলে প্রতিমা বললো, এই বেদিটা এখানে কেন?

প্রতিভা ওটার গায়ে লাঠি ঠুকে দেখলো, বেশ নিরেটই মনে হচ্ছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে বেদির পেছন দিকে গেলো। আর তখনই চাপা উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে উঠলো–দিদি, এদিকে আয়তো!

প্রতিভার চিৎকার শুনে প্রতিমা আর তানিয়া ছুটে গেলো ওর কাছে। টর্চের আলোয় যা দেখলো–রীতিমতো রোমহর্ষক দৃশ্য।

বেদির পেছনে ছোট একটা দরজার মতো অন্ধকার গহ্বর। টর্চের আলোয় দেখা গেলো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

প্রতিভা উত্তেজিত গলায় বললো, মনে হয় গুপ্তধনের সন্ধান পেতে যাচ্ছি আমরা। দিদি চল, নেমে দেখি।

প্রতিমা রাজী হলো না–মনে হচ্ছে সিঁড়িটা গুমঘরে নেমে গেছে। যেখানে ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা যখ বসিয়েছিলেন। আমার মন বলছে এখানে ঢুকলে আর বেরুতে পারবো না।

প্রতিভা বিরক্ত হয়ে বললো, তোর মতো একটা ভীতুর ডিমকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে। তানিয়া, তুইও কি মনে করিস নিচে নামলে যখ আমাদের গিলে খাবে?

তানিয়া মুশকিলে পড়লো। প্রতিমা নিচে নামতে চাইছে না, প্রতিভা চাইছে। ওরও ইচ্ছে করছিলো নেমে দেখতে নিচে কী আছে, কিন্তু প্রতিমাকে বাদ দিয়ে নামাটা ঠিক হবে না। প্রতিভাকে বললো, যখের কথা বাদ দে। মাটির নিচের এসব পুরোনো সুড়ঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস থাকতে পারে। গ্যাস মাস্ক না নিয়ে নামাটা মনে হয় উচিৎ হবে না।

এটা ঢাকা নয় তানিয়া। রত্নেশ্বরীতে তুই গ্যাস মাস্ক কোথায় পাবি? দিদি বরং বাইরে অপেক্ষা করুক। তুই আর আমি চল সিঁড়ির শেষ মাথা পর্যন্ত নেমে দেখে আসি নিচে কী আছে।

তানিয়া ইতস্তত করে প্রতিমাকে বললো, তুমিও চলো না প্রতিমাদি। যখ যদি থাকেও দিনে দুপুরে ওরা বেরুবে না।

প্রতিমা হতাশ হয়ে বললো, চল, তবে কোনও অঘটন ঘটলে প্রতিভার কান দুটো আমি আস্ত রাখবো না।

ঠিক আছে দিদি। কিছু হলে আমার কান দুটো কেটে ঘোষদের ঘিয়ে ভাজা কুকুরটার গলায় ঝুলিয়ে দিস।

মনে থাকে যেন। বলে টর্চ হাতে প্রতিমা সবার আগে পাতালে নামার সিঁড়িতে পা রাখলো। এর পেছনে প্রতিভা, সবার শেষে তানিয়া।

দিনের বেলা বেরুচ্ছে বলে ওরা কেউ গরম কাপড় আনেনি। আজকাল দিনে বেশ গমই থাকে। নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওদের রীতিমতো শীত লাগলো।

প্রতিমা মনে মনে–দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, রক্ষা কর মা, বলতে বলতে নিচে নামছিলো। প্রতিভা নামতে নামতে গুণছিলো কয় সিঁড়ি নামা হলো। তানিয়া জোরে জোরে শ্বাস টেনে বোঝার চেষ্টা করছিলো অস্বস্তিকর কোনও গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায় কিনা। বিজ্ঞান বইতে অবশ্য পড়েছে কার্বন মনো অক্সাইড গ্যাসে কোনও গন্ধ থাকে না। মৃত্যু কিভাবে আসবে টেরও পাওয়া যায় না। পত্রিকায় এমন খবর মাঝে মাঝে ছাপাও হয়, পুরোনো কুয়ো বা ম্যানহোলে ঢুকে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে মানুষ মারা গেছে।

সিঁড়ির ধাপগুলো বেশ উঁচু। পনেরো সিঁড়ি নামার পর ওরা একটা বড় সড় ঘরের ভেতর নিজেদের আবিষ্কার করলো। ঘরের ভেতরটা বেশ পরিষ্কার। প্রতিভা চাপা গলায় বললো, দিদি, বুঝতে পারছিস না এ ঘরে লোকজন চলাফেরা করে?

তুই টের পেলি কি করে?

ওই কোণায় দেখ, এক টুকরো ন্যাকড়া পড়ে আছে। দেখে মনে হয় না বেশি পুরোনো।

কাছে গিয়ে টর্চের আলোয় ওরা দেখলো সবুজ রঙের এক টুকরো ন্যাকড়া পড়ে আছে। পাশেই একটা সুড়ঙ্গের মতো সোজা চলে গেছে।

প্রতিভা বললো, এই সুড়ঙ্গ কোথায় গেছে বলতে পারবি দিদি?

আমি কী করে জানবো কোথায় গেছে। খবরদার ওটার ভেতর ঢোকার কথা বলবি না।

ঠাকুরমার কাছে শুনিসনি, পুরোনো মহলের বউ ঝিরা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে চান করার জন্য বংশী নদীতে যেতো!

তানিয়া অবাক হলো–সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যেতে হবে কেন?

বা রে, রাস্তা দিয়ে গেলে লোকজন দেখে ফেলবে না? ঠাকুরমার মা নাকি গঙ্গা স্নানে যেতেন পাল্কিতে করে। পালকি সুদ্ধো বেহারারা ওঁকে গঙ্গায় ডুবিয়ে আনতে।

তানিয়া প্রতিমার দিকে তাকালো–প্রতিমাদি, চলোই না দেখে আসি সুড়ঙ্গটা নদীর কোন জায়গা দিয়ে বেরিয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিমা মনে মনে দুর্গানাম জপতে জপতে সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকলো। মহা উত্তেজিত প্রতিভা আর তানিয়া ওকে নিরবে অনুসরণ করলো। সুড়ঙ্গের ভেতরটা বেশি প্রশস্ত নয়। তানিয়া একবার সুড়ঙ্গের দেয়ালে হাত দিয়ে চমকে উঠেছে। বরফের মতো ঠাণ্ডার আর ভেজা দেয়াল।

মিনিট তিনেকের ভেতর মাথা নিচু করে হাঁটার পর আবার একটা ঘরের ভেতর এলো ওরা। ঠিক আগের ঘরটার মতো, সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। বাঁ পাশে আরেকটা সুড়ঙ্গ। প্রতিমা সিঁড়ির ওপর আলো ফেলে দেখলো আস্ত দরজা রয়েছে সিঁড়ির মাথায় এবং দরজাটা বন্ধ।

প্রতিভা বললো, দরজার ওপাশে কী দেখতে হবে দিদি।

ও যে আবার পাশের সুড়ঙ্গে ঢুকতে চায়নি এতেই খুশি হয়ে প্রতিমা সামনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো। ওর পেছনে প্রতিভা আর তানিয়া। ঠিক তখনই নিচে থেকে বাজখাই গলায় কে যেন চিৎকার করে উঠলো, কে রে?

প্রতিমা এমনই চমকে উঠলো যে হাত থেকে টর্চ গড়িয়ে পড়লো। আরেকটু হলে ও নিজেই হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়তো। সিঁড়ি থেকে নিচে পড়েই টর্চটা নিভে গেলো। জমাট বাধা কুচকুচে কালো অন্ধকারের চাদর দিয়ে কেউ যেন ওদের মুড়ে ফেললো।

নিচে থেকে ওদের ওপর টর্চের জোরালো আলো ফেললো কেউ। এত জোরালো আলো যে তাকাতে গিয়ে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। চোখের ওপর হাত তুলে ওরা আলোটা আড়াল করলো। ধুপধাপ

অনেকগুলো পায়ের শব্দ হলো। অচেনা ষণ্ডা মতো তিনটে লোক ছুটে এসে জাপটে ধরলো ওদের। প্রতিমা মুহূর্তের ভেতর জ্ঞান হারালো।

.

১২. কালো ছায়ার রহস্য

দুপুরে খাওয়ার সময় প্রতিমার মার টনক নড়লো মেয়েরা সেই যে বেরিয়েছে এখন পর্যন্ত ফেরেনি। অন্য দিন খাওয়ার বেশ আগেই ফিরে আসে। পিসিমা চিন্তিত গলায় বললেন, আমার মনে কু ডাকতাচে বউ। তুমি বনমালীরে জলদি পাঠাও অগোরে বিচরাইতে।

বনমালী তো সাদেকের সঙ্গে বেরিয়েছে দিদি। পিসিমার কথা শুনে প্রতিমার মার বুক কেঁপে উঠলো।

বনমালী না থাকুক, ঘাটের মড়া একটারে পাঠাও না।

একজন নয়, প্রতিমাদের খুঁজতে দুজন পেয়াদাকে দু দিকে পাঠানো হলো। একজন গেলো গ্রামের দিকে, আরেকজন নদীর ধারে। বিভূতিরঞ্জন কিছুক্ষণের জন্য খামারে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আরেক পেয়াদা পাঠালেন সাদেক হোসেনকে ডাকতে।

আধঘন্টা পর সাদেক হোসেন হন্তদন্ত হয়ে এসে জানতে চাইলো, প্রতিমারা এখনও ফেরেনি?

প্রতিমার মা, বাবা, পিসিমা সবাই বসেছিলো নিচের তলার বৈঠক খানায়। সাদেকের কথা শুনে পিসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, কোইথেইকা ভাতে মরা পুলিস কতগুলা আনচ, চক্কের সামনে থেইক্কা তিন তিনটা ছেমরি হাওয়া ওইয়া গেল?

সাদেক বিব্রত গলায় বললো, পুলিশ তো বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ওদের বলেছি অচেনা কেউ আশে পাশে নজরে পড়লে খবর দিতে।

আরে মর! সাদেকের কথায় পিসিমা আরও বিরক্ত হলেন–তোমার পুলিশ কি এই গ্যারামের? ক্যাঠা চিনা আর ক্যাঠা অচিনা–বুঝবো কেমতে? বাড়ির উপর নজর রাখনের কী ওইচে? গুণ্ডা হালারা কি বাড়ি উঠাইয়া লয়া যাইবো? অগো নজর রাখতে কও বাড়ির মাইনসেপো উপরে।

প্রতিমার মা ভেজা গলায় সাদেককে বললেন, তুমি বনমালীকে সঙ্গে নিয়ে ওদের খুঁজে বের করো বাবা।

প্রতিমার বাবাও বললেন, বনমালীকে সঙ্গে নিয়েই যাও। লোকজনকে বনমালী জিজ্ঞেস করতে করতে যাবে।

দুপুরের খাওয়া সবার মাথায় উঠলো। বিভূতিরঞ্জন বার বার বাড়ি থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করলেন। বনমালীকে সঙ্গে নিয়ে সাদেক গ্রামের ঘরে ঘরে ঢু মারলো। এমন কী মোক্ষদা পর্যন্ত মেয়েদের খুঁজতে বেরুলো।

বিকেল বেলা সাদেক ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এসে বললো, আমার মনে হচ্ছে এটা শনির দলের কাজ। টাকার ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য মেয়েদের কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আপনারা চিন্তা করবেন না। আজ রাতেই ওদের উদ্ধার করবো।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মোক্ষদাকে ডেকে পিসিমা বললেন, ছ্যারারে এক গ্যালাস নেষুর সরবত বানায়া দে।

প্রতিমার মা ভেজা গলায় বললেন, ওর তো দুপুরেরর খাওয়াও হয়নি। তুমি বরং মুখ । হাত ধুয়ে এসো, মোক্ষদা টেবিলে খাবার দিক।

বিভূতিরে লগে বহায়া দ্যও। আমার গলা দিয়া কিছু নামবো না। তুমি এটু জল মুখে দ্যও বউ।

সাদেকের ক্ষিদে পেয়েছিলো। খাওয়ার জন্য ওকে বলতে হলো না। বিভূতিরঞ্জন নাম মাত্র মুখে তুললেন। তাঁরও খেতে ইচ্ছে করছিলো না। সাদেককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মনে হয় শনির দল আজ যোগাযোগ করবে?

ওদের কথা অনুযায়ী তাই তো করার কথা। আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। আজ রাতেই শনিকে গ্রেফতার করবো।

গ্রামে যে ঘুরলে ওরা টের পেয়ে যায়নি তো তুমি পুলিশের লোক?

না। যারা জানতে চেয়েছিলো বনমালীই বলেছে আমি আপনার ভাগ্নে, কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। ওকে আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলাম আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে কী বলবে।

তোমার পুলিশ?

না বললে প্লেইন ড্রেস-এ ওদের বুঝবে কিভাবে ওরা যে পুলিশ। ওদের বলেছি জিজ্ঞেস করলে বলবে নতুন পেয়াদার কাজে বহাল হয়েছে।

সাদেকের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিভূতিরঞ্জন চুপচাপ বসে থাকলেন। মেয়েদের জন্য উদ্বেগ, আর দুশ্চিন্তায় ভেতরে ভেতরে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন তিনি। দশ লাখ টাকা তার কাছে কিছুই নয়। জমিদারি না থাকলেও জমি যা এখনও দখলে আছে তার দাম কয়েক কোটি টাকা হবে। নিজের মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তানিয়ার কথাও ভাবছিলেন তিনি। নূরউদ্দিনকে তিনি কী জবাব দেবেন? তাঁর

কথাতেই ওরা এ বাড়িতে এসে থাকছে। এ মুহূর্তে তার সবচেয়ে প্রিয় এই বন্ধুটির অভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন।

খাওয়া শেষ করে সাদেক বললো, দশ লাখ টাকা আপনি আলাদা করে একটা ব্যাগে রাখুন।

শুকনো গলায় বিভূতিরঞ্জন বললেন, সকালেই রেখেছি।

ব্যাগ কোথায়?

আমার ঘরের সিন্দুকে।

ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো বনমালী। হাঁপাতে হাঁপাতে হাতে ধরা সবুজ খাম এগিয়ে দিয়ে বললো, এক ব্যাড়ায় আমারে এই চিঠিখান দিয়া ভাইগা গেল।

বিভূতিরঞ্জন কাঁপা হাতে খাম খুলে সবুজ চিঠি পড়লেন–মালাউন বিভূতিরঞ্জন, তোমাকে বলিয়াছিলাম পুলিশে খবর না দিতে। তুমি ভাগিনার পরিচয় দিয়া বাড়িতে পুলিশের লোক আনিয়া রাখিয়াছ। তাই তোমার পেয়ারের বন্ধু মুরতাদ নূরউদ্দিন আর তোমার মেয়েদের আমরা আমাদের কবজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। হারামজাদা পুলিশের লোকটিকে বলিবে রাত আটটায় একা টাকার ব্যাগ লইয়া রত্নেশ্বরী মন্দিরের সামনের বটগাছের তলায় রাখিয়া সোজা যেখান হইতে আসিয়াছে সেইখানে চলিয়া যাইতে। আমাদের লোক সারাক্ষণ তোমাদের গতিবিধির উপর নজর রাখিতেছে। কোনও রকম চালাকি করিলে কাল সকালে মেয়ে তিনটির লাশ বংশী নদীতে ভাসমান দেখিবে। ইতি শনি।

চিঠি পড়ার পর সাদেক ধমকের গলায় বনমালীকে বললো, তোমাদের সবাইকে একশ বার বলা হয়েছে অচেনা কোনও লোক দেখলে ওদের আটকে রাখবে। কেন এই লোককে যেতে দিলে?

বনমালী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, হুজুর, মা কালীর দিব্যি কইতাছি, হারামির পোলারে আমি ধাওয়া করছিলাম। রাস্তায় উষ্ঠা খাইয়া পইড়া যাওনে অরে ধরতে পারি নাই।

এই দ্যাখেন আমার পায়ের নখ উইল্টা গ্যাছে।–বিভূতিরঞ্জন আর সাদেক দুজনেই দেখলো বনমালীর ধুলোমাখা পায়ের বুড়ো আঙুলের চারপাশে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। বিভূতিরঞ্জন সাদেককে বললেন, শনির লোককে আটকে কী লাভ হতো যখন আমার মেয়েরা ওদের কজায়? বনমালী যাও, ডেটল দিয়ে পা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে নাও।

বনমালী চলে যাওয়ার পর সাদেক বললো, বদমাশ শনি আমার ব্যাপারে জানলেও আমার সঙ্গে যারা এসেছে তাদের সন্দেহ করেনি।

তুমি কী করতে চাও?

আপনাদের রহেশ্বরীর মন্দিরে কি রোজ পুজো হয়?

হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আরতি দেয়া হয়। নাম গান হয়।

আপনার যদি আপত্তি না থাকে চারজন পুলিশ আজ সন্ধ্যায় ধুতি পরে কপালে তিলক কেটে ভক্ত সেজে মন্দিরে পুজো দিতে যাবে। আমি টাকা নিয়ে বটতলায় যাবো। টাকাটা রেখে আমি চোখের আড়াল হলেই ওদের লোক টাকা নিতে আসবে। আর তখনই পুলিশরা ওদের ঘিরে ফেলবে।

তোমার পুলিশদের কাছে তো আর্মস নেই।

আপনার তো দুটো পিস্তল আছে। ও দুটো ওদের কাছে থাকবে। আমার পিস্তল আমি নেবো। আপনার বন্দুকধারী পেয়াদাদের বলে দেবেন কোনও অবস্থায় যেন বাড়ির বাইরে না যায়। আমি চাই না ওদের লোক ধরা পড়ার পর ওরা বাড়িতে হামলা করুক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিভূতিরঞ্জন বললেন, ঠিক আছে সাদেক, তুমি যেভাবে বলবে তাই হবে।

সাদেক আত্মবিশ্বাসভরা গলায় বললো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। এর চেয়ে বড় বড় ক্রিমিনাল আমি একা কাবু করেছি।

সন্ধ্যেবেলায় ভক্ত সেজে দুজন পুলিশ কোমরে পিস্তল আর দুজন দুটো ছুরি খুঁজে মন্দিরে পুজো দিতে গেলো। পিসিমা ওদের শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে পুজো দিতে হয় আর নামগান করতে হয়, যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। ওরা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই পিসিমার ছেলে অধীর এলো, সঙ্গে দাড়িওয়ালা, চশমাপরা, মাথায় টুপি দেয়া এক হুজুর টাইপের লোক।

ব্যাগ কাঁধে অধীরকে বারান্দায় উঠতে দেখে পিসিমা ছুটে গিয়ে–তুই ক্যামতে আইলি অধীর? জানস না তো কী–বলতেই পেছনে অচেনা হুজুরকে দেখে তিনি জিভ কেটে লম্বা ঘোমটা টানলেন।

অধীর বললো, মামার এমন বিপদ, ঘরে থাকি কী ভাবে? প্রিন্সিপালকে বলে চলে এলাম। মা ইনি হচ্ছেন নূরউদ্দিন কাকার আগের স্কুলের টিচার। তিনিও চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। শুনেছেন মামা আর নূরউদ্দিন কাকা স্কুল করবেন। তাই দেখা করতে এসেছেন।

হুজুরকে নিয়ে অধীর বাড়ির ভেতর ঢুকলো। ঠিক তখনই ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে সারা বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেলো। পিসিমা ভয় পেয়ে ভাঙা গলায় ডুকরে উঠলেন–হায় ভগমান, অখন আবার কারেন ক্যান যায় গা?

পকেট থেকে লাইটার বের করে ওটার আলোতে হুজুরকে নিয়ে অধীর বৈঠকখানায় ঢুকলো। বিভূতিরঞ্জন আর সাদেক ভেতরে বসে চা খাচ্ছিলেন। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে অধীর ওর মামার সঙ্গে হুজুরের পরিচয় করিয়ে দিলো।

প্রথমে উটকো ঝামেলা মনে করে বিরক্ত হয়েছিলেন বিভূতিরঞ্জন। পরে ভাবলেন এ রকম বিপদের সময় বাড়িতে একটা বাড়তি লোক থাকা ভালো। বললেন, নূরউদ্দিন ঢাকা গেছে। এখনই এসে যাবে। আপনি বিশ্রাম নিন। এরপর বনমালীকে ডেকে বললেন, নূরউদ্দিনের ঘরে আলো জ্বেলে এঁকে ওখানে নিয়ে যাও।

ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনমালী হারিকেন যা ঘরে ছিলো মোক্ষদাকে সঙ্গে নিয়ে সব কটা জ্বালিয়েছে। বৈঠকখানায় একটা হারিকেন রেখে হুজুরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। বিভূতিরঞ্জন সাদেকের সঙ্গে অধীরের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাদেক মৃদু হেসে ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললো, আপনি স্যারের আসল ভাগ্নে আর আমি নকল ভাগ্নের পরিচয় দিয়ে এখানে আস্তানা গেড়েছি। স্যারের ভাগ্নে ভাগ্য ভালোই বলতে হবে।

অধীর বললো, আপনি যখন আছেন মামার আর ভয় কী!

বিভূতিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুই তো জানিস না, আজ দুপুর থেকে প্রতিমা, প্রতিভা আর তোর নূরউদ্দিন কাকার মেয়ে তানিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বলো কী মামা? আঁতকে উঠলো অধীর। সাদেকের দিকে তাকিয়ে জিজেস করলো, আপনি থাকতে তিন তিনটে মেয়ে কোথায় হারালো?

সাদেক গম্ভীর হয়ে বললো, বিকেলে শনির চিঠি পেয়েছি। শনি ওদের আটকে রেখেছে। পুলিশে খবর দেয়াতে নাকি ওরা এটা করেছে।

পুলিশে খবর দেয়ার কথা ওরা জানলো কী ভাবে?

আমি পুলিশের লোক এটা ওরা জেনেছে। তবে আমার সঙ্গে যে চারজন এসেছে ওদের ওরা সন্দেহ করেনি।

আপনার সঙ্গীরা কোথায়?

ভক্ত সেজে মন্দিরে পুজো দিতে গেছে। এই বলে অধীরকে ওর পরিকল্পনার কথা খুলে বললো সাদেক।

অধীর বললো, এ সময় কারেন্ট চলে যাওয়ার পেছনে শনির কোনও হাত নেই তো?

আলো না থাকাতে সাদেকও খুব চিন্তিত ছিলো। বললো, হতে পারে। আমি বরং একটু ঘুরে আসি।

অন্ধকারে যাবেন কী ভাবে?

আমার সঙ্গে টর্চ আছে। এই বলে সাদেক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মোক্ষদা অধীরের জন্য চা আর জলখাবার এনে টেবিলে রাখলো। অধীর ওকে বললো, মোক্ষদাদি, বাইরে গিয়ে দেখো তো সাদেক চলে গেলো কি না।

মোক্ষদা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অধীর বললো, মামা, তুমি কী ভীষণ বিপদে পড়েছো ধারণাও করতে পারবে না।

বিভূতিরঞ্জন কোনও কথা না বলে প্রশ্নভরা চোখে ওর দিকে তাকালেন। পিসিমা বললেন, কোন হালার সনিরে দস লাখ টাকা দিতে ওইবো, ছেমরি তিনটা লাপাত্তা ওইয়া গ্যাচে–বিপদের আর বাকি কী দেখলি অধীর?

মোক্ষদা এসে বললো, দারোগা চইলা গ্যাছে।

অধীর সোফা ছেড়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে বিভূতিরঞ্জনের হাত ধরে বললো, এক্ষুণি চলো মামা। নূরউদ্দিন কাকার কাছে সব শুনবে।

অধীরের সঙ্গে দ্রুত পা ফেলে যেতে যেতে বিভূতিরঞ্জন বললেন, নূরউদ্দিনকে কোথায় পেলি?

চুপ করো মামা। তোমার বাড়ির দেয়ালেরও কান আছে। এই বলে অধীর ওর মামাকে নিয়ে নূরউদ্দিনের ঘরে ঢুকলো।

টেবিলের ওপর হারিকেন জ্বলছিলো। বিভূতিরঞ্জন দেখলেন আলনায় রাখা নূরউদ্দিনের জামার পকেট হাতড়াচ্ছেন হুজুর। রেগে গিয়ে বললেন, আপনি কী করছেন? ছিঃ ছিঃ একজন শিক্ষক হয়ে–

অধীর ঘরের দরজা বন্ধ করে বিভূতিরঞ্জনের কাছে এসে চাপা গলায় বললো, কাকে কী বলছো মামা? ইনিই তো নূরউদ্দিন কাকা!

এ্যাঁ, বলিস কী? হুজুরের কাছে এসে ভালো করে দেখে বিভূতিরঞ্জন বললেন, তাইতো, এ সবের মানে কী নূরউদ্দিন?

বলছি। গম্ভীর গলায় হুজুররূপী তানিয়ার বাবা বললেন, শনিকে টাকা দেয়ার ব্যাপারে সাদেক কী প্ল্যান করেছে আগে সব খুলে বলল।

সাদেকের পরিকল্পনার কথা বলার আগে প্রতিমাদের অন্তর্ধান আর শনির দ্বিতীয় চিঠির কথা বন্ধুকে জানালেন। সাদেকের পরিকল্পনার কথা শুনে তানিয়ার বাবা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অধীরের দিকে তাকালেন। অধীর চাপা গলায় বললো, মামা, শনি বাইরের কেউ নয়, সাদেকই হচ্ছে আসল শনি।

ঘরের ভেতর যেন পাঁচশ পাউণ্ডের বোমা ফাটলো। বিভূতিরঞ্জন কী বলবেন কথা খুঁজে পেলেন না। তার চোয়াল ঝুলে গেলো। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেলেন। অসহায় চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন।

নূরউদ্দিন বললেন, কাল মাঝ রাতে মেয়েরা পুরোনো মহলে আলোর সংকেত দেখে সাদেককে বলতে এসেছিলো। ওকে ঘরে না পেয়ে আমাকে বলেছে। আমার মনে হয়েছিলো সাদেক বোধহয় শনির আলোর সংকেত দেখতে পেয়ে ওদের ধরতে গেছে। তবু সন্দেহ হলো। মেয়েদের ওপরে পাঠিয়ে ওর ঘরে গেলাম। ব্যাগ হাতড়ে দেখি ব্যাগে ওর। পিস্তল রয়েছে। খটকা লাগলো–ব্যাগে পিস্তল রেখে ও নিশ্চয় শনির সন্ধানে যায়নি। ঠিক করলাম সকালে থানায় গিয়ে ওর ব্যাপারে খোঁজ নেবো। আজকাল তো জামাতের লোক পুলিশ, আর্মি–সব জায়গায় রয়েছে। হতে পারে সাদেকের সঙ্গে জামাতীদের সম্পর্ক আছে। সকালে থানায় যাওয়ার আগে ভাবলাম পুরোনো মহলটা দেখে যাই। সেখানে গিয়ে এ ঘর সে ঘর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে নিচের তলার ভেতরের একটা ঘরে আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেলের সন্ধান পাই। টানেলের শেষ মাথায় একটা বড় ঘর দেখতে পেলাম। মশালের আলোয় কয়েকজন এসে সেখানে কী যেন বলাবলি করছে। তখনই আমার লাইটারের গ্যাস ফুরিয়ে গেলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওদের পষ্ট দেখলাম। কথাও পষ্ট শুনলাম। ওরা ছিলো তিনজন। সাদেক, বনমালী আর তোমাদের মন্দিরের পুজারি।

বল কী নূরউদ্দিন! ভাঙা গলায় বললেন, বিভূতিরঞ্জন–বনমালী শনির দলের লোক!

হ্যাঁ বিভূতি। কথা বোলো না, শুনে যাও। হাতে সময় বেশি নেই। ওরা ঠিক করেছে তোমার টাকা আর দেবীর গয়না নিয়ে আজ রাতেই চলে যাবে। কথা সেরে ওরা পাশের ঘরে। ঢুকলো। এমন সময় পেছনে টর্চের আলো দেখে আমি চট করে সরে গিয়ে বাঁ পাশের আরেকটা টানেলে ঢুকে গেলাম। একটু পরে দেখি আমাদের তিন মেয়ে কথা বলতে বলতে টর্চ হাতে সামনের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের সাবধান করতে যাবো তখনই ওরা ধরা। পড়ে গেলো। মেয়েদের পাশের ঘরে আটকে রেখে দুটো বন্দুকধারী পাহারাদার বসিয়ে সাদেকরা চলে গেলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে। ওদের কথা শুনে মনে হলো এই সিঁড়ি মন্দির থেকে নেমে এসেছে। আমি যে পথ দিয়ে ঢুকেছিলাম সে পথ ধরেই হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর সোজা মির্জাপুর থানায়। ওসি হাকিম সাহেবকে বললাম তোমার চিঠির

কথা। তিনি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। কোনও চিঠিই পাননি তিনি। সাদেক হোসেন বলেও কাউকে চেনেন না। চিঠিই যখন পাননি–ফোর্স পাঠাবারও প্রশ্ন ওঠে না। ওঁকে সব কথা খুলে বললাম। পনেরো জনের ফোর্স নিয়ে ওসি নিজে এসেছেন, জেলে নৌকায় জেলে সেজে। এতক্ষণে মন্দির আর পুরোনো মহল তারা ঘিরে ফেলেছেন। এখন শুধু সাদেককে ধরে তাদের হাতে তুলে দেয়ার অপেক্ষা।

ওকে তো হাতে নাতে ধরতে হবে।

হ্যাঁ, অধীরের ব্যাগে নোটের আকারে কাগজের বাণ্ডিল আছে। বাণ্ডিলের ওপরে নিচে অবশ্য দুটো আসল নোট আছে। দশ লাখ টাকার ঝুঁকি নেয়া উচিৎ না। তুমি অধীরের বাণ্ডিলগুলো তোমার ব্যাগে ঢুকিয়ে নাও। ও টাকা নিয়ে বেরুলে আমরা ওকে অনুসরণ করবো।

তানিয়ার বাবা যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন বাকি ঘটনা সেভাবেই ঘটলো। শুধু মন্দিরের দুজন ভক্ত জেলেদের হাতে বন্দুক দেখে পিস্তল বের করেছিলো। ভক্তদের ভেতর আবার দুজন জেলে থাকায় সুবিধে করতে পারেনি। সাদেককে টাকার ব্যাগ হাতে রহেশ্বরী মন্দিরের সামনে গ্রেফতার করলেন স্বয়ং ওসি। ঠিক তখনই মন্দিরে, রায়বাড়িতে আর বাজারে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠলো।

মন্দিরের প্রতিমা রাখার বেদীর পেছনে পুরোনো মহলের মতো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। বিভূতিরঞ্জন আর নূরউদ্দিন ওসিকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের উদ্ধার করতে নামলেন। বন্দুকধারী পাহারাদারদের বলা ছিলো রাত নটার সময় মেয়েদের নেয়ার জন্য বনমালী আসবে লোক নিয়ে। তারপর ওদের ছুটি। মশালের আবছা আলোয় কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা গ্রেফতার হয়ে গেলো। সাদেক, বনমালী আর পুজারিকে নিয়ে শনির দলের দশজনকে গ্রেফতার করে রায়বাড়িতে আনা হলো।

ওসির কঠিন জেরা আর সঙ্গে উত্তম মধ্যম থাকাতে সাদেক সব কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। রতেশ্বরীর মন্দির লুট করার পরিকল্পনা করেছে ও নব্বই সালের রায়টের সময়। তখন ও মাদ্রাসায় পড়তো। শুনেছে এই মন্দিরে কয়েক লক্ষ টাকার অলঙ্কার আছে। প্রথমে ভয় দেখিয়ে পুরোনো পুজারিকে তাড়িয়ে নতুন পুজারি ঢুকিয়েছে। তারপর বনমালীকে ঢুকিয়েছে পেয়াদার চাকরিতে। ওকে যেন কোনওভাবেই কেউ সন্দেহ করতে না পারে সেজন্য মেয়েদের আটকে রেখেছিলো।

পিসিমা বললেন, আরে হারামজাদা, পুজারির কামে কারে ঢুকাইছিলি ক। তগো দলের মাইনষেরে তো না!

হাতবাঁধা পুজারি পাশে দাঁড়িয়েছিলো। হাউমাউ করে কেঁদে বললো, না পিসিমা, আমি অগো দলের না। আমি রাধানগরের চক্রবর্তী বাড়ির পোলা। আমারে মাসে এক হাজার টাকা বেতন দিব কওনে প্যাটের দায়ে এই কাম করছি। আমারে মাপ কইরা দ্যান।

চোপ রও হারামজাদা। চুরিকা বাস্তে হামোকা মন্দিরমে ঘুসা, ফির জেয়াদা বাত করতা! রেগে গেলে পিসিমা ঢাকাইয়া উর্দু বলেন।

অধীর বনালীকে বললো, তা বাবা বনমালী, তুমি কোন মাদ্রাসার ছাত্র ছিলে?

হাত বাঁধা বনমালী কথা না বলে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ওসি তাঁর ব্যাটন দিয়ে এমন বেকায়দা জায়গায় বাড়ি মারলেন–বনমালী আই বাপ, বলে চিৎকার করে উঠলো। আরেক বাড়ি দিতেই গড় গড় করে বললো, ওর নাম হাশেম মিয়া। ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় ফাজিল পর্যন্ত পড়েছে। খুনের মামলায় আসামী হয়ে ফেরারী ছিলো অনেক দিন। পরে সাদেক হোসেন তাকে এখানে কাজে ঢোকার বুদ্ধি দেয়। ওর সঙ্গে রফা হয়েছিলো, দেবীর গয়নার তিন ভাগের এক ভাগ ওর, এক ভাগ পুজারির। নগদ টাকা পুরোটা সাদেকের।

ওদের জবানবন্দী লিখে নিয়ে ওসি দশটা নাগাদ চলে গেলেন। মোক্ষদা এসে বললো, আইজ রাইতে কি কারো খাওন দাওন লাগবো না?

তানিয়া বললো, খাবো তো বটেই। দুপুরে শয়তানরা শুধু চা আর বিস্কুট খেতে দিয়েছিলো। তোমাকেও বলি বাবা, তুমি গোয়েন্দাগিরি করার জন্য পুরোনো মহলে ঢুকেছিলে, আর আমি ভাবলাম তুমি বুঝি ওদের দলের লোক।

চোখ পিট পিট করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে নূরউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, কেন এমন ভাবলি?

তোমার জুতোর ছাপ দেখে।

প্রতিমা অবাক হয়ে বললো, তুই চিনলি কী ভাবে ওটা যে নুরু কাকার জুতো ছাপ!

তোমাদের বলিনি? সকালে আমি সবার পায়ের জুতোর তলা দেখে মুখস্ত করে নিয়েছিলাম।

নূরউদ্দিন মৃদু হেসে বললেন, ভাগ্যিস তোরা কাল রাতে শনির আলোর সংকেত দেখেছিলি। নইলে শনিকে ধরা কারও সাধ্য ছিলো না।

তুমি যদি গোয়েন্দাগিরিতে না নামতে তাহলে আমাদের এতক্ষণে কোথায় পাচার করতো কে জানে!

পিসিমা বললেন, হ্যাঁর লাইগাই তো কই, ছেমরি গো এত সাহস থাকন বালা না।

বিভূতিরঞ্জন মৃদু হেসে বললেন, মেয়েরা সাহস না দেখালে দেবীর গয়না আর দশ লাখ টাকা যে হাতছাড়া হতো দিদি!

ওইচে, আর সাহস দ্যাখান লাগবো না। ওই ছেমরিরা ওঠ, জলদি খানা খাইবার যা।

প্রতিভা লাফিয়ে উঠলো–চল তানিয়া। খেয়ে দেয়ে আজ রাতে আবার জাগতে হবে। আমাদের পূর্ব পুরুষের কুপিত আত্মারা আজ রাতে নিশ্চয় আমাদের আশীর্বাদ করতে আসবেন।

প্রতিমা খাবার ঘরে যেতে যতে বললো, এ কথা বলছিস কেন?

বারে, শনি কি ওদের কম জ্বালিয়েছে? আর কিছু না হোক শনির অত্যাচার থেকে তো ওঁদের রক্ষা করেছি।

প্রতিভার কথার ধরন দেখে রাগতে গিয়ে হেসে ফেললো প্রতিমা। তানিয়া ওর সঙ্গে গলা মেলালো।